বিজ্ঞাপন।

পাঠমঞ্জরী মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহাতে গদ্য ও পদ্য দুই-ই সন্নিবেশিত হইয়াছে। অল্পবয়স্ক বালক ও বালিকাদিগের পাঠের উপযোগী গদ্য-পদ্যময় গ্রন্থের তাদৃশ বহুল প্রচার নাই। স্কুল-সমূহে পাঠমঞ্জরীর অধ্যাপনা হইলে, আশা করি, সুকুমার-মতি বালক বালিকাগণ একখানি পুস্তকেই, গদ্য ও পদ্য দুইয়েব প্রণালী বুঝিতে সমর্থ হইবে.

এই পুস্তকে দৃষ্টান্ত স্থলে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ এবং কয়েক জন প্রধান ব্যক্তির জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা পড়িলে বোধ হয় শিক্ষার্থিগণ ভাষা-শিক্ষার সহিত নীতি-জ্ঞানও লাভ করিতে পারিবে.

পাঠমঞ্জরীর মুক্তা প্রভৃতি কয়েকটী প্রবন্ধের বিবরণ, 'রহস্য সন্দর্ভ' নামক মাসিক পত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। চারুপাঠ ও ধর্ম্মনীতি এবং শরীরপালন ও স্বাস্থ্যরক্ষার মতের সহিত এই পুস্তকের কোন কোন প্রবন্ধোক্ত মতের সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। বলা বাহুল্য, বিষয়ের সাদৃশ্য বশতঃই মতের একতা সংঘটিত হইয়াছে।

পুস্তকখানি সরল ভাষায়, সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগের শিক্ষার উপযোগী করিয়া, লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা শিক্ষার্থিদিগের উপকারে আসিলেই পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব, ইতি।

হিন্দুহোষ্টেল,
কলিকাতা।
২৫ এ শ্রাবণ, ১২৮৫।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সূচী।

পাঠমঞ্জরী।

মনোযোগ।

মন দিয়া কোন কাজ করিলে, সেই কাজ শীঘ্র শীঘ্র শেষ হয়। আমাদের সকল কাজই মনোযোগের সহিত করা উচিত। মনোযোগ না থাকিলে, কি লেখা পড়া, কি আমোদ আহ্লাদ, কিছুতেই মানুষের প্রবৃত্তি থাকে না। যাহার কোন কাজে মনোযোগ নাই সে, কেবল এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, অথবা কাঠের পুতুলের মত এক স্থানে চুপ করিয়া থাকে। সংসারে তাহা দ্বারা কোন কাজই হয় না। এইরূপে সমুদায় কাজে শিথিল হওয়াতে, সে একবারে অলস ও অপদার্থ হইয়া পড়ে।

প্রতিদিন যে যে কাজ করিতে হইবে, সময় ভাগ করিয়া, এক এক সময়ে তাহার এক একটী কাজ, মনোযোগের সহিত করা উচিত। এক কাজের মধ্যে আর এক কাজ আনিয়া ফেলিলে, যেমন অমনোযোগ প্রকাশ পায়, তেমন কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। যদি এক এক সময়ে, এক একটী কাজ কর, তাহা হইলে প্রতিদিন সকল কাজেই অনেক সময় পাইবে; কিন্তু এক সময়ে দুই তিনটী কাজে হাত দিলে সমস্ত বৎসরেও কোন কাজ শেষ করিবার সময় পাইবে না। যে লেখা পড়ার সময় মনোযোগ না দিয়া, খেলার বিষয় ভাবে, তাহার লেখা পড়া কিছুই হয় না, লোকে অমনোযোগী বলিয়া তাহার নিন্দা করে, পাঠশালায় পাঠ বলিতে না পারাতে, সে সমপাঠিদের সহিত পাড়িতে পারে না, গুরু মহাশয় তাহাকে নানারূপ ভৎসনা করেন, এবং লেখা পড়ায় মনোযোগ না দেওয়াতে, সে মূর্খ হইয়া চিরকাল কষ্ট পায়। এইরূপে যে আহারের সময় পড়ার বিষয় ভাবে, অথবা সঙ্গিদের সহিত খেলিবার সময় অন্য মনে চিন্তা করে, সে সংসারে

বিজ্ঞ ও জ্ঞানী হইতে পারে না, অন্যমনস্ক ও অমনোযোগী বলিয়া, সঙ্গিগণ আর কখনও তাহার কাছে আসিতে চায় না, এবং তাহার সহিত আলাপও খেলা করে না।

যখন যে কাজের সময় উপস্থিত হইবে, তখন সেই কাজ মনোযোগের সহিত করিবে। লেখা পড়ার সময় মনোযোগ দিয়া, লেখা পড়া করা কর্ত্তব্য। খেলিবার সময় উপস্থিত হইলে, সঙ্গিদের সহিত নিশ্চিন্ত মনে খেলা করা উচিত। মনোযোগ না থাকিলে, লোকের সকল কাজ নষ্ট হয়। ইহার উদাহরণ-স্থলে ভরত রাজার উপাখ্যান বলা যাইতেছে।

পূর্ব্বকালে ভরত নামে এক মহাভাগ্যবান্ রাজা ছিলেন। তিনি আপনার রাজ্য ছাড়িয়া তপস্যার জন্য শালগ্রাম নামক স্থানে বহুকাল বাস করেন। মহারাজ ভরত গুণিদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি কখন কাহারও হিংসা করিতেন না। প্রতি দিন যজ্ঞের কাষ্ঠ ও ফুল আনিয়া, দেবতার পূজা করিতেন। দেব-পূজা ও দেবতার আরাধনা ব্যতীত, তাঁহার আর কোনও কাজ ছিল

না। এক দিন ভরত গঙ্গাস্নান করিয়া, ঘাটে সন্ধ্যা বন্দনা শেষ করিয়াছেন, এমন সময়ে একটী গর্ভবতী হরিণী সেই ঘাটে জল পান করিতে আসিল, হরিণী জল পান প্রায় শেষ করিয়াছে, এই সময়ে একটী ভয়ঙ্কর সিংহ-ধ্বনি হইল। হরিণী সিংহের গর্জ্জনে ভয় পাইয়া লাফ দিয়া তীরে উঠিল নদীর তীর অতিশয় উচ্চ ছিল, হঠাৎ লাফ দিয়া সেই উচ্চ তীরে উঠাতে, হরিণীর গর্ভস্রাব হইল এবং গর্ভস্থ শিশু নদীর জলে পড়িল। মহারাজ ভরত হরিণীর শাবকটীকে জল হইতে তুলিয়া তীরে আনিলেন। এ দিকে হরিণী গর্ভস্রাবদোষে ও অতিশয় উচ্চ তটে উঠিবার শ্রমে ক্লান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ভরত হরিণ শিশুটীকে আশ্রমে আনিয়া, পুত্রের মত পালন করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বদাই হরিণ-বালকের বিষয় ভাবিতেন। যদি সেই শিশু হরিণটী আশ্রম হইতে কিছু দূরে যাইত, এবং আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব করিত, তাহা হইলে ভরত আকুল হইয়া, নানারূপ আশঙ্কা করিতেন। “কখন্ শিশুটী ফিরিয়া আসিবে, কখন্ তাহাকে দেখিয়া চক্ষু সার্থক

করিব ” ভরত সর্ব্বদা এই চিন্তাতেই মগ্ন থাকিতেন। এইরূপে সর্ব্বদা হরিণ-শিশুর বিষয় ভাবাতে, তপস্যায় ভরতের কিছুমাত্র মনোযোগ রহিল না, সুতরাং তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হইল। তিনি মৃত্যু-কালেও ঈশ্বর-চিন্তায় মন দিলেন না। কেবল হরিণের বিষয় ভাবিতে ভাবিতেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তপস্যায় মনোযোগ না দেওয়াতে, ভরত তপস্যার ফল কিছুই পাইলেন না।

দেখ, মহারাজ ভরত তপস্যার জন্য আপনার রাজ্য, ধন, পরিজন সমস্তই ছাড়িয়াছিলেন। ভাল খাইব, ভাল পরিব বলিয়া, তিনি কাহারও নিকট কখন কিছু ভিক্ষা করেন নাই। নিজের অপরিমিত অর্থ থাকিতেও, কেবল দেবসেবার জন্য বনের সামান্য ফল মূল খাইয়া, কষ্টে দিনপাত করিতেন। রাজত্বের সুখ ছাড়িয়া, এত কষ্ট স্বীকার করিলেও, কেবল মনোযোগের অভাবে তাঁহার তপস্যা সিদ্ধ হইল না। তিনি যদি মনোযোগ দিয়া, তপস্যা করিতেন, তাহা হইলে যে তাঁহার কত পুণ্যলাভ হইত, বলিয়া শেষ করা যায় না। ভরত দেবসেবার জন্য রাজ্য

পরিজন সমস্ত ছাড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু হরিণ-শিশুর ভাবনা ছাড়িতে পারেন নাই। শেষে এই ভাবনাই তাঁহার সকল কষ্ট, সকল পরিশ্রম ও সকল স্বার্থত্যাগ নষ্ট করিল। তিনি যে বিষয়ের জন্য এত কষ্ট পাইয়াছিলেন, মনোযোগ না দেওয়াতে, সে বিষয়ে সিদ্ধ হইতে পারিলেন না। অতএব তোমরা মনোযোগ দিয়া সকল কাজ করিবে। কোন বিষয়ে মন না দিয়া যদি এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াও, তাহা হইলে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। মহারাজ ভরত যেমন তপস্যার ফল পাইলেন না, তোমরাও তেমনই কোন কাজের ফল পাইবে না।

ঈশ্বরে ভক্তি।

করেছেন যিনি এই জগত সৃজন,
যাঁহার কৃপায় আছে বাঁচি জীবগণ।
লোহিত বরণ রবি উঠিয়া গগনে,
আলোকিত করে ধরা যাঁহার শাসনে।
শোভাকর শশধর যাঁহার কৃপায়,
প্রকাশি বিমল কর জগত জুড়ায়!

যাঁহার আদেশ-বলে শীতল পবন,
যতনে দেহের তাপ করে নিবারণ।
যাঁর কৃপা-বলে নিদ্রা প্রতি ঘরে ঘরে,
আসিয়া জীবের সদা শ্রান্তি নাশ করে।
সূক্ষ্ম পরমাণু আর পর্ব্বত, সাগর,
অতুল মহিমা যাঁর ঘোষে নিরন্তর।
তিনি হন বিশ্বপাতা দয়ার আকর,
পরম আরাধ্য দেব, জগত-ঈশ্বর।
আছেন সকল স্থানে তিনি বিদ্যমান,
করেন সকল কাজে মঙ্গল বিধান।
ভক্তিভাবে প্রীত মনে যুড়ি দুই হাত,
দিবস যামিনী তাঁরে কর প্রণিপাত।

অধ্যবসায়।

কোন বিষয়ে একবার বিফল হইলে, যতক্ষণ ফল লাভ না করা যায়, ততক্ষণ সেই বিষয়ে নিরন্তর যত্ন করাকে অধ্যবসায় কহে। সকলেরই অধ্যবসায় শিখা উচিত। অধ্যবসায় না থাকিলে কোন বিষয়ে কৃত-কার্য্য হওয়া যায় না। একটী কাজে একবার ফল না পাইলে, যে একবারে

হতাশ হইয়া পড়ে, এই সংসারে সে কোন কাজই করিতে পারে না। একবার কোন কাজ বিফল হইলে, পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন ও মনোযোগের সহিত সেই কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। যত্ন ও মনোযোগ দিয়া, কাজ করিলে, এক দিন না এক দিন অবশ্যই সেই কাজের ফল পাওয়া যায়।

মনোযোগ, পরিশ্রম, যত্ন ও উৎসাহ না থাকিলে, অধ্যবসায় শিক্ষা হয় না। কোন কাজ একবার করিতে না পারিলে, যে বিরক্ত হইয়া সেই কাজ ফেলিয়া রাখে, সে অমনোযোগী, পরিশ্রম-বিমুখ, যত্নহীন ও নিরুৎসাহ। অমনোযোগী পরিশ্রম-বিমুখ, যত্নহীন ও নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নহে। যাহারা কোন কাজে মন না দিয়া, অথবা কোন কাজ করিতে উৎসাহের সহিত পরিশ্রম ও যত্ন না করিয়া, চুপ করিয়া থাকে, তাহারা কখনও অধ্যবসায় শিখিতে পারে না। প্রত্যুত, অকর্ম্মণ্য ও অলস হইয়া, চিরকাল কষ্ট পায়।

অধ্যবসায়-বলে লোকে কেমন ধন, মান

খ্যাতি লাভ করে, তাহা দেখাইবার জন্য পাদরী কেরি সাহেবের জীবন-বৃত্তান্ত এস্থলে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

উইলিয়ম কেরি সাহেব বিলাতের এক পল্লী-গ্রামে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। তিনি ঐ গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। কেরি প্রথমে আপন জন্মগ্রামের বিদ্যালয়ে পিতার নিকট লেখা পড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু দরিদ্রতা প্রযুক্ত তাঁহার পিতা অধিক কাল পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিলেন না। সুতরাং কেরি যৎসামান্য ইংরাজী শিখিয়া, অল্প বয়সে জুতা-নির্ম্মাণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একজন পাদুকাকারের নিকট কিছুকাল এই কার্য্য শিখিয়া, পরে স্বয়ং জুতার দোকান খুলিলেন। যদিও কেরি এই নিকৃষ্ট ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তথাপি কখনও লেখা পড়ার প্রতি অবহেলা করেন নাই। তিনি আপন কাজ হইতে কিঞ্চিৎ অবসর পাইলেই, ইংরাজী ও লাটিন ভাষা শিখিতে প্রবৃত্ত

হইতেন। এইরূপে দৃঢ়তর অধ্যবসায়ের সহিত শিক্ষা করিয়া, কেরি অল্প সময়েই উক্ত ভাষা দুটীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রে এতদূর ব্যুৎপন্ন হইলেন যে, আঠার বৎসর বয়ঃক্রম-কালে, গ্রামের কৃষকদিগকে ধর্ম্ম-বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

ইহার পর জুতার ব্যবসায় ছাড়িয়া, কেরি ধর্ম্মযাজক ও গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক হন। কিছুকাল এই কার্য্য করিয়া, তিনি ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশে, বিলাত হইতে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ই নবেম্বর কলিকাতায় আগমন করেন। অপরিচিতের ন্যায় এক মাস কলিকাতায় থাকিয়া, কেরি হুগলীর নিকটবর্ত্তী বান্দেল গ্রামে উপস্থিত হন। কিন্তু সে স্থানে অভীষ্ট সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া, তমাস নামে তাঁহার একজন বন্ধুর সহিত নবদ্বীপে গমন করেন, এবং সেখানে পণ্ডিতদিগের সহিত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া, কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন। এই সময়ে অর্থের অভাবে, কেরির অতিশয় কষ্ট

উপস্থিত হইল। আমাদের দেশের একজন সদাশয় ধনীর সাহায্যে, তিনি সপরিবারে কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ দীন ভাবে অধিক কাল কলিকাতায় থাকা, তাঁহার বড় কষ্টকর হইয়া উঠিল। এ জন্য কেরি সুন্দরবনে যাইয়া, কৃষি-কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু সুন্দরবনে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর প্রাদুর্ভাব দেখিয়া, তিনি এই সংকল্প হইতে বিরত হইলেন। এইরূপ হীন অবস্থায় সংকল্প সিদ্ধ না হওয়াতে, কেরি কিছু মাত্র উদ্যম বা উৎসাহ-শূন্য হইলেন না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর অধ্যবসায়ের সহিত আপনার ভরণপোষণের উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে মালদহ জেলার অন্তঃপাতী মদনবাটী গ্রামে অড্নী নামক একজন সাহেবের নীলকুঠীতে অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইল। কেরি তমাসের অনুরোধে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে ঐ পদ গ্রহণ করিলেন। নীলকুঠীর অধ্যক্ষ হইয়া, কেরি নির্ব্বিঘ্নে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ ও ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই

স্থানে তাঁহার উদ্যোগে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। কেরি এই বিদ্যালয়ে দরিদ্রের সন্তান-দিগকে বাঙ্গালা, সংস্কৃত এবং পারস্য ভাষা শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

কেরি ভারতবর্ষে আসিয়াই মনোযোগ, অধ্যবসায় ও যত্নের সহিত বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া, উভয়াতে ব্যুৎপন্ন হন। অনন্তর তিনি বহু পরিশ্রমে সরল বাঙ্গালা ভাষায় "নিউ-টেষ্টমেণ্ট" নামে খ্রীস্ট ধর্ম্মপুস্তকের অনুবাদ করেন। কিন্তু শেষে এই অনুবাদ মুদ্রাঙ্কনের কোনও সুবিধা হইল না। কেরি ইহাতে নিরুৎ-সাহ হইলেন না। এই সময়ে তাঁহার অধ্যবসা-য়ের কথা শুনিলে, অবাক্ হইতে হয়। কেরি আপনার অনুবাদিত পুস্তক ছাপাইবার নিমিত্ত, নিজেই বাঙ্গালা অক্ষরের ছাঁচ আনিয়া, অক্ষর প্রস্তুত করিলেন, এবং অড্‌নী সাহেবের প্রদত্ত একটী কাঠের মুদ্রাযন্ত্রে পুস্তক মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেরির এই অসাধারণ অধ্যব-সায়ের বার বার প্রশংসা করিতে হয়।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরি মদনবাটী হইতে

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী খিদিরপুরে আসিয়া, একটী ক্ষুদ্র নীল কুঠী ক্রয় করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে মার্শমান প্রভৃতি কয়েক জন ধর্ম্মপ্রচারক এদেশে আসিলে, কেরি খিদিরপুর হইতে শ্রীরামপুরে যাইয়া, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। কেরি এই স্থানে আপনার মুদ্রাযন্ত্র আনিয়া, পুস্তক সকল মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এই সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। যাহা হউক, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্র মাসে কেরি, মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনে, ভারতবর্ষের প্রধান শাসন-কর্ত্তা (গবর্ণর জেনারেল) লর্ড ওয়েলেস্‌লির স্থাপিত কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ-নামক বিদ্যালয়ে বাঙ্গালার অধ্যাপক হন। এই সময়ে ভাল বাঙ্গালা পুস্তক ছিল না এজন্য ছাত্রদিগের বাঙ্গালা শিক্ষার বড় অসুবিধা হইত। কেরি এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত, রাম বসু নামে এক ব্যক্তি দ্বারা, রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত রচনা করাইয়া প্রকাশ করেন। ইহার পর কেরি স্বয়ং বাঙ্গালা

ভাষায় এক খানি ব্যাকরণ ও কথাবলী নামে এক খানি পুস্তক রচনা করিয়া প্রচার করেন।

এক বৎসর পরে কেরি, উক্ত ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে সংস্কৃতের শিক্ষক হন। এই সময়ে তিনি বিশিষ্ট পরিশ্রম ও যত্নের সহিত সংস্কৃত ভাষায় একখানি বৃহৎ ব্যাকরণ সঙ্কলন করিয়া, লর্ড ওয়েলেস্‌লির সাহায্যে প্রকাশ করেন। এই ব্যাকরণ এক হাজার চব্বিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়। ইহার পর কেরি, ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের বার্ষিক পরীক্ষায় বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের পরীক্ষক হন। পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে, তিনি সরল সংস্কৃত ভাষায় একখানি অভিনন্দন-পত্র লিখিয়া, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে পাঠ করেন। এই অভিনন্দন-পত্র লর্ড ওয়েলেস্‌লিকে দেওয়া হয়। ইহাতে ওয়েলেস্‌লির সুশাসন-প্রণালী ও ফোর্ট উইলিয়ম বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার আন্তরিক যত্নের বিষয় সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছিল। এই সংস্কৃত রচনা দেখিয়া, ওয়েলেস্‌লি কেরির অনেক প্রশংসা করেন।

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো ভারতবর্ষের গব-

র্ণর জেনারেল হইয়া আইসেন। এই সময়ে কেরি সংস্কৃত রামায়ণ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া, তিন খণ্ডে সমাপ্ত করেন। লর্ড মিণ্টো এই অনুবাদ দেখিয়া, কেরির বিস্তর সুখ্যাতি করেন। রামায়ণের অনুবাদের পর কেরি, মার্শমানের সাহায্যে সমাচার-দর্পণ নামে একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র, শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশ করেন। সমাচার-দর্পণ, সমুদয় বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের আদি।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কেরি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাঙ্গালা-অনুবাদক হইয়া, বাঙ্গালা ভাষায় একখানি আইন গ্রন্থের অনুবাদ করেন, এবং ইহার পর এক খানি বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই অভিধান ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়। কেরির অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা এই অভিধান অনেক উৎকৃষ্ট। ইহা দ্বারা তাঁহার নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

গ্রন্থ প্রচার ব্যতীত, কেরি সাহেব, কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য একটী কৃষি-সমাজ স্থাপন করেন। এই সমাজ দ্বারা এদেশের অনেক উপ-

কার হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞান ও বহুদর্শিতায় কেরি পৃথিবীতে এমন প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে অনেক সম্মান-সূচক উপাধি প্রাপ্ত হন। এইরূপে সকল স্থানে সমাদৃত হইয়া কেরি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ই জুন ৭৩ বৎসর বয়সে মানব-লীলা সম্বরণ করেন। শ্রীরামপুরের গির্জ্জার প্রাঙ্গণে তাঁহার সমাধি হয়।

দেখ, উইলিয়ম কেরি এক মাত্র অধ্যবসায়ের গুণে সামান্য মুচীর ব্যবসায় হইতে পৃথিবীতে এত প্রসিদ্ধ ও আদরণীয় হইয়াছিলেন। তিনি এই অধ্যবসায়-বলে স্বদেশের চারিটী ও এদেশের ত্রিশটী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া, অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ প্রচার করেন। এজন্য ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল প্রভৃতি অনেক বড় বড় লোকি তাঁহার আদর ও সম্মান করিতেন। অর্থের অভাবে কেরি অনেকবার কষ্টে পড়িয়াছিলেন; কিন্তু অধ্যবসায়ের বলে শেষে সে কষ্ট দূর করিয়া, সুখ সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদি অধ্যবসায় না থাকিত, তাহা হইলে কেরি কখনও এত বড় লোক হইতে পারি-

তেন না। তাঁহাকে চিরকাল সামান্য মুচীর ন্যায় কষ্টে থাকিতে হইত। অধ্যবসায় থাকিলে যে, সামান্য অবস্থা হইতেও পৃথিবীতে বড় লোক হওয়া যায়, কেরির জীবন-বৃত্তান্তে তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। কেরির ন্যায় অধ্যবসায়-সম্পন্ন হওয়া সকলেরই উচিত।

মধু-মক্ষিকা।

গাছের ডালেতে মধু-মক্ষিকা-নিকর,
গড়িতেছে চাক দেখ, কিবা মনোহর।
ফুলে ফুলে সারা দিন করিয়া ভ্রমণ,
সুযতনে মধু সবে করে আহরণ।
নাহি আর কোন চিন্তা অভাবের ভয়,
অবিরত চাকে মধু করিছে সঞ্চয়।
কেহই থাকেনা বসি আলস্য করিয়া,
সবাই করিছে কাজ, তৎপর হইয়া।
সবাই উৎসাহ আর উদ্যম দেখায়,
সবাই শ্রমের ফল জগতে জানায়।
উৎসাহ উদ্যম আর পরিশ্রম-বলে,
অপরূপ মধুচক্র গড়িছে সকলে।

যদি তুমি এই মধু-মক্ষিকার মত,
উৎসাহ উদ্যম ভরে পরিশ্রমে রত
হও, কত ফল তবে পাবে ধরাতলে,
আদরে তোমার নাম ঘুষিবে সকলে
উৎসাহ, উদ্যম, শ্রম (বলি বার বার)
মৌমাছির কাছে শিশু! শিখ অনিবার।

সংসর্গ।

সংসর্গের অর্থ এক সঙ্গে থাকা। সর্ব্বদা ভাল লোকের সংসর্গে থাকা উচিত। যাহারা সুশীল ও শান্ত, যাহারা কখনও অসৎকার্য্যে মন দেয় না, যাহারা মনোযোগ দিয়া, লেখা পড়া শিখে, তাহাদের সঙ্গে থাকিলে স্বভাব ভাল হয়, মন প্রফুল্ল থাকে এবং অনেক বিষয় শিখিতে পারা যায়। হিন্দুগণ কথায় বলিয়া থাকেন, "সৎ-সঙ্গে কাশীবাস"; অর্থাৎ কাশীতে বাস করিলে যেমন পুণ্য হয়, সাধু লোকের সঙ্গে থাকিলেও তেমন পুণ্য হইয়া থাকে। যাঁহারা সচ্চরিত্র, বয়সে বড় ও অধিক লেখা পড়া শিখিয়া, অনেক বিষয় জানিয়াছেন, তাঁহারা যদি স্নেহ করেন,

কাহাকে সঙ্গে লন, তাহা হইলে শান্ত ভাবে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহাদের উপদেশ শুনা উচিত। জ্ঞানী লোকের উপদেশ শুনিলে, অনেক শিখা যায়। কেবল বহি পড়িয়া, যত জ্ঞান লাভ না হয়, বিজ্ঞ লোকের উপদেশ শুনিলে, তাহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

মন্দ লোকের সংসর্গে থাকা উচিত নহে। মন্দ লোকের সংসর্গে থাকিলে, স্বভাব মন্দ হয় ও পাপ কার্য্যে ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। যাহাদের স্বভাব ভাল নয়, তাহারা প্রায়ই পরের অনিষ্ট করে এবং নানাপ্রকার পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকার লোকের সঙ্গে থাকিলে, মিথ্যা বলা, চুরী করা, প্রবঞ্চনা করা প্রভৃতি অনেক দোষে চরিত্র দূষিত হয়। কুসংসর্গে থাকিলে যেরূপ দুর্দ্দশায় পড়িতে হয়, তাহা দেখাইবার জন্য, এক বাদসাহের বিবরণ এস্থলে লিখিত হইতেছে।

হিন্দুদিগের রাজত্ব গেলে, দিল্লীতে মুসলমানদিগের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ইঁহাদের বংশের নাম পাঠান। এই পাঠান-বংশীয় মুসলমানদিগের মধ্যে কৈকোবাদ নামে এক ব্যক্তি এক সময়ে

দিল্লীর অধিপতি ছিলেন। কৈকোবাদ যখন দিল্লীর বাদসাহ হন, তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর। নিজাম নামে এক ব্যক্তি কৈকোবাদের প্রধান মন্ত্রী হয়। ইহার চরিত্র সাতিশয় মন্দ ছিল। এই মন্দ লোকের সংসর্গে পড়াতে কৈকোবাদের চরিত্র দূষিত হইয়া যায়। কৈকো-বাদ কুচরিত্র নিজামের পরামর্শে অল্প বয়সে মদ্য-পানাদি নানাপ্রকার পাপকার্য্যে এত আসক্ত হন যে, শীঘ্রই তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ে। কৈকোবাদের পিতা বখর খাঁ এই সময়ে বাঙ্গা-লার নবাব ছিলেন। তেজস্বিতা ও সৎ-স্বভাবের জন্য তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। পুত্র কুসংসর্গে পড়িয়া, খারাপ হইয়া যাইতেছে শুনিয়া, বখর খাঁ তাঁহাকে সদুপদেশ দিবার জন্য দিল্লীতে আসি-লেন। এ দিকে কুমন্ত্রী নিজাম কৈকোবাদকে পরামর্শ দিল, বাঙ্গালার নবাব, দিল্লীর বাদসাহের অনুমতি ব্যতীত সৈন্য লইয়া, দিল্লীতে আসি-য়াছে, সুতরাং সে রাজদ্রোহী; তাহার সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কৈকোবাদ কুমন্ত্রীর কুহকে মুগ্ধ হইয়া, পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর

হইলেন; বখর খাঁ পুত্রের এই ভাব দেখিয়া, তাঁহাকে লিখিলেন, "বৎস! যুদ্ধ করিতে হয়, পরে করিও, আমি অগ্রে তোমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।" কৈকোবাদ পিতার এই পত্র পাইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কুমন্ত্র নিজাম, তাঁহাকে এই পরামর্শ দিল যে, কৈকোবাদ রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, সিংহাসনে বসিয়া থাকিবেন, বখর খাঁ সামান্য ভৃত্যের ন্যায় সেলাম করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন।

বখর খাঁ কি করেন, রাজ-সভায় আসিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া, পুত্রকে তিনবার সেলাম করিলেন। এরূপ অবস্থাতেও, কৈকোবাদ সিংহাসনে রহিয়াছেন দেখিয়া, বখর খাঁ নিতান্ত দুঃখ বোধ করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। কৈকোবাদ পিতাকে কাঁদিতে দেখিয়া, সিংহাসন হইতে নামিয়া, তাঁহার পা ধরিতে গেলেন, বখর খাঁ পুত্রকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিয়া, হস্তদ্বারা তাঁহার গলদেশ ধারণ করিলেন। তখন পিতা

পুত্র, উভয়েই শোকে অধীর হইয়া, অনবরত অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। সভাস্থ লোকে ইহা দেখিয়া, একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। কৈকোবাদ সমুচিত সম্মান ও আদর করিয়া, পিতাকে নিজের সিংহাসনে বসাইলেন। পিতা পুত্রে অনেক ক্ষণ আলাপ হইল। অনন্তর বখর খাঁ, কয়েক দিন নির্জ্জনে বসিয়া, পুত্রকে সৎপথে আসিতে অনেক উপদেশ দিলেন। কৈকোবাদ প্রকৃত পক্ষে বড় সরল ও কথার বাধ্য ছিলেন। কেবল দুষ্টস্বভাব নিজামের সংসর্গে থাকাতে, তিনি নানা প্রকার গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এক্ষণে পিতার সৎপরামর্শে তাঁহার স্বভাব শুধরাইতে লাগিল। তিনি পিতার নিকট অঙ্গীকার করিলেন, আর কখনও নিজামের কথা শুনিবেন না, এবং তাহার কথায় কুকর্ম্মে রত হইবেন না। বখর খাঁ পুত্রের অঙ্গীকারে সন্তুষ্ট হইয়া, আপনার রাজ্যে গমন করিলেন।

বখর খাঁ বাঙ্গালায় চলিয়া গেলে, নিজাম অবসর পাইয়া, আবার কৈকোবাদকে নানা প্রকার কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল। কৈকোবাদ,

কুমন্ত্রীর সংসর্গে পড়িয়া, আবার দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বদা পাপকার্য্য করাতে, শীঘ্রই কৈকোবাদের পক্ষাঘাত রোগ হইল। এদিকে রাজ্যে নানা প্রকার গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। এই গোলযোগের সময় এক দল লোক প্রবল হইয়া, কৈকোবাদের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসন কাড়িয়া লইল।

দেখ, কৈকোবাদ দিল্লীর বাদসাহ হইয়া, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি যদি পিতার বশে থাকিয়া, তাঁহার সদুপদেশ মত কার্য্য করিতেন, নিজে কত সুখ ভোগ করিতে পারিতেন, আপন রাজ্যের কত উন্নতি করিতে পারিতেন। পিতার সংসর্গে থাকিলে কৈকোবাদের চরিত্র কখনও দূষিত হইত না, এবং কখনও তিনি অকর্ম্মণ্য হইয়া, অকালে প্রাণ হারাইতেন না। কেবল কুসংসর্গে পড়িয়াই, তরুণ বয়সে কৈকোবাদের সর্ব্বনাশ হইল। সর্ব্বদা সৎসংসর্গে থাকা উচিত। কুসংসর্গে থাকিয়া, আপনার অনিষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে।

বিদ্যা।

নাহি আর পৃথিবীতে বিদ্যা সম ধন,
যতনে বিদ্যার চর্চ্চা কর, দিয়া মন।
অন্য ধন চোরে পারে, করিতে হরণ,
জ্ঞাতিগণ নিতে পারে করিয়া বণ্টন।
কিন্তু বিদ্যা-ধনে চোর, না পারে হরিতে,
জ্ঞাতিগণ অসমর্থ, সে ধন বাঁটিতে।
অন্য ধন বিতরণে, ক্রমে হয় ক্ষয়,
বিদ্যা-ধন বিতরণে, বাড়ে অতিশয়।
অদ্ভুত ঘটনা কত, এই বিদ্যা-বলে
হইতেছে অবিরত, দেখ ধরাতলে।
বিদ্যুৎ আকাশ হ'তে আসিয়া ধরায়,
নিমেষে সংবাদ আনে, বিদ্যার কৃপায়।
বিদ্যার মহিমা বলে, শকট, তরণী,
চালাইছে বাষ্প দেখ, আসিয়া আপনি।
এই বাষ্প-যানে চড়ি, কেমন ত্বরায়,
হৃষ্ট মনে কত লোক, দূর দেশে যায়।
বিদ্যার প্রসাদে দেখ, কেমন অদ্ভুত,
জলের নীচেতে পথ হয়েছে প্রস্তুত।

এই রূপ কত শত আশ্চর্য্য ব্যাপার,
বিদ্যা-বলে পৃথ্বীতলে হ'তেছে প্রচার।
যে জন যতনে করে, বিদ্যা উপার্জ্জন,
জ্ঞানী বলি, লোকে তারে মানে সর্ব্বক্ষণ।
সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব স্থানে তাহার সম্মান,
কেহই গৌরবে নয়, তাহার সমান।
লেখা পড়া করি তার, কত সুখ হয়,
দিন দিন খ্যাতি তার, বাড়ে অতিশয়।
সুযতনে লভি এই, বিদ্যা মহাধন,
অমূল্য সন্তোষে মগ্ন, হয় তার মন।
কিন্তু লেখা পড়া যেই, কভু নাহি করে,
মূর্খ হয়ে থাকে সেই, সংসার ভিতরে।
কত কষ্ট হয় তার, খাইতে পরিতে,
কভু সে সুখের মুখ, না পায় দেখিতে।
সংসারে কেহই তারে, কভু নাহি মানে,
সমাদর নাহি তার, হয় কোন খানে।
বিদ্যা-রসে যার নাহি স্নিগ্ধ হয় প্রাণ,
পশুর সমান সেই পশুর সমান।
অযত্নেলা কভু এই বিদ্যা উপার্জ্জনে,
কর'না কর'না সবে, শুন এক মনে।

ভাসমান উদ্যান।

মানব জাতি যত্ন ও পরিশ্রম-বলে যে কত অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। তাড়িত বার্ত্তাবহ, বাষ্পীয় যান ও বাষ্পীয় শকট প্রভৃতি নানা প্রকার আশ্চর্য্য ঘটনা, কেবল মনুষ্যের পরিশ্রম ও যত্নে সম্পন্ন হইয়া, পৃথিবীর উপকার করিতেছে। এই স্থলে যে একটী আশ্চর্য্য উদ্যানের বিষয় লিখিত হইতেছে, তাহাও লোকের পরিশ্রম ও যত্নে নির্ম্মিত হইয়া, নানা অভাব মোচন করিতেছে।

পৃথিবী যে চারিটী মহাদেশে বিভক্ত, আমেরিকা তাহাদের মধ্যে একটী। এই আমেরিকা আবার দুই ভাগে বিভক্ত; উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা। উত্তর আমেরিকায় মেক্সিকো নামে একটী দেশ আছে। এই দেশের প্রধান নগরের নামও মেক্সিকো। মেক্সিকো নগর দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার চারিদিকে তুষারে আচ্ছাদিত পর্ব্বত-শ্রেণী ও নির্ম্মল বারিপূর্ণ হ্রদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। নগরে প্রবেশ করি-

বার জন্য পাঁচটী সুদীর্ঘ পথ আছে। মেক্‌সিকো নগর, শোভা ও সমৃদ্ধির জন্য চিরকাল প্রসিদ্ধ। একদা স্পেন-দেশীয় লোকেরা এই দেশে আসিয়া, ইহার অধিবাসিদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করে। হতভাগা অধিবাসিগণ বিদেশীর আক্রমণে ভয় পাইয়া, পর্ব্বত ও হ্রদ-পরিবেষ্টিত মেক্‌সিকো নগর মধ্যে আশ্রয় লয়। এই রূপে বহু সংখ্যক লোকে নগর পরিপূর্ণ হওয়াতে, ক্রমে খাদ্য সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে। ভূমির উর্ব্বরতা প্রযুক্ত যদিও মেক্‌সিকোতে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত, তথাপি তদ্দারা নগরবাসিদিগের অভাব মোচন হইত না। কারণ, হ্রদের জল উচ্ছ্বসিত হওয়াতে, কয়েক মাস শস্য-ক্ষেত্র সকল জলমগ্ন থাকিত। যে কিছু শস্য বাজারে আসিত, স্পেন-দেশীয়গণ তাহাও লুটিয়া লইত। এই রূপে খাদ্য সামগ্রীর অভাব উপস্থিত হওয়াতে, মেক্‌সিকোর অধিবাসিগণ এমন শস্য-ক্ষেত্র ও বাগান প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিল যে, হ্রদের জলে তাহা ডুবাইতে পারিবে না; প্রত্যুত তাহা জলের উপর ভাসিতে থাকিবে, এবং ইচ্ছা-

নুসারে তাহা একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে পারা যাইবে। অভাব সকল উন্নতির মূল। অভাব উপস্থিত হইলেই মনুষ্য নানা প্রকার হিত-কর কার্য্য সম্পন্ন করিতে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া থাকে। মেক্‌সিকো নগরে খাদ্য সামগ্রীর অভাব হওয়াতে, অধিবাসিগণ এই রূপে জলের উপর শস্য-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল, এবং আপনাদের অধ্যবসায় ও পরিশ্রম-বলে তাহাতে কৃতকার্য্যও হইল। জলের উপর ভাসে বলিয়া, এই সমস্ত বাগান, "ভাসমান উদ্যান" নামে প্রসিদ্ধ।

যে প্রণালীতে এই ভাসমান উদ্যান প্রস্তুত হয়, তাহা অতি সহজ। বর্ষাকালে আমাদের দেশের জঙ্গল হইতে যে কাঠের মাড় ভাসিয়া আইসে, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। মেক্সি-কো-বাসিগণ তদ্দেশের য়্যাল বৃক্ষের এই রূপ বড় বড় মাড় প্রস্তুত করিয়া, জলে ভাসাইয়া দেয়। জলাভূমির গুল্ম ও অপরাপর লঘু পদার্থ একত্রিত করিয়া রজ্জু দ্বারা, এই য়্যাল বৃক্ষের সহিত দৃঢ় রূপে বদ্ধ করে। পরে উহার উপর দাম ও উত্তম

বিছাইয়া মাটী দেয় এবং জলাভূমির কর্দ্দম তুলিয়া, ঐ মাটীর উপর নিক্ষেপ করে। এই রূপে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে, উহাতে ফল, পুষ্প ও শস্যাদির বীজ বপন করা হয়। হ্রদের যে পঙ্কে এই সমস্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা সাধারণ ভূমি অপেক্ষা অধিক উর্ব্বর, এজন্য উক্ত ক্ষেত্রে যে সমস্ত বৃক্ষ ও শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা সাধারণ ভূমির বৃক্ষ ও শস্য অপেক্ষা অধিক তেজস্বী হইয়া থাকে। এই ভাসমান উদ্যানের সহিত জেলে ডিঙ্গীর ন্যায় এক এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা থাকে। উদ্যান-স্বামিদিগকে তদ্দেশীয় ভাষায় "চিনাম্পা" কহে। বৃহৎ বৃহৎ উদ্যানে চিনাম্পা-দিগের বাসের জন্য এক একটী ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যায়। ইচ্ছা হইলে, চিনাম্পারা আপন আপন বাগান, পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র নৌকার সহিত রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া, দুই তিন জনের সাহায্যে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়। যখন এই বাগান গুলি, ফল পুষ্পে শোভিত হইয়া, হ্রদের জলের উপর ভাসিতে থাকে, তখন অতি সুন্দর দেখায়। মনুষ্যগণের পরিশ্রমে ও যত্নে, যে কেমন রমণীয় ও সুন্দর

বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে, এই ভাসমান উদ্যান তাহার একটী দৃষ্টান্ত। কিছুর অভাব হইলে, পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া, সেই অভাব মোচন করা উচিত। মেক্সিকোর লোকে যদি যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, জলের উপর এই শস্য-ক্ষেত্র প্রস্তুত না করিত, তাহা হইলে খাদ্যের অভাবে যে তাহাদের কত কষ্ট হইত, বলিয়া শেষ করা যায় না।

মাতার স্নেহ।

কে আমারে, স্নেহ-ভরে সদা স্তন্য দিয়া,
বাড়ালেন হৃষ্ট মনে যতন করিয়া?
ধরিলেন দশ মাস কে মোরে উদরে?
স্নেহময়ী মাতা তিনি, অবনী ভিতরে।

কে আমারে, নিশি দিন পীড়ার সময়ে,
করিতেন যত্ন কত, আকুল হৃদয়ে?
সুস্থ হ'লে, ভাসিতেন কে সুখ-সাগরে?
স্নেহময়ী মাতা তিনি, অবনী ভিতরে।

কে আমারে, ক্ষুধা হ'লে আহার প্রদানে,
তুষিতেন, জুড়াতেন তাপিত পরাণে?

বেড়াতেন কোলে করি, কে সদা আদরে ?
স্নেহময়ী মাতা তিনি, অবনী ভিতরে।

কে আমারে, নিশি দিন যতন করিয়া,
করেছেন সুখী, নিজে যাতনা সহিয়া ?
ভাবিতেন কে আমারে সদাই অন্তরে ?
স্নেহময়ী মাতা তিনি, অবনী ভিতরে।

কে আমারে, বলি সোণা, মাণিক, রতন,
করিতেন কোলে তুলি, কতই চুম্বন ?
কাঁদিলে সান্ত্বনা কে বা দিতেন আদরে ?
স্নেহময়ী মাতা তিনি, অবনী ভিতরে।

কে আমারে, এই রূপে, সদা কায় মনে
করেছেন এত বড়, কতই যতনে ?
দিয়েছেন এত সুখ, এত স্নেহ করে ?
স্নেহময়ী মাতা তিনি, অবনী ভিতরে।

যতনে মাতার সেবা, সরল অন্তরে,
করিবে সকলে সদা, ভক্তি প্রীতি-ভরে।
পরম দেবতা মাতা, জানিও অন্তরে,
স্নেহময়ী মাতা, এই অবনী ভিতরে।

মুক্তা।

মুক্তার নাম অনেকেই জানে। লোকে ইহাকে বহুমূল্য রত্নের মধ্যে গণনা করে। ইহা দ্বারা যে অলঙ্কার প্রস্তুত হয়, তাহা ব্যবসায়িগণ বাজারে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। ফলে, মুক্তার মূল্য অত্যন্ত অধিক। এক একটী মুক্তার মূল্য লক্ষ টাকারও অধিক হইয়া থাকে।

এই বহুমূল্য রত্ন, একটী সামান্য জীব হইতে উৎপন্ন হয়। সমুদ্রে অথবা পুষ্করিণীতে, যে সকল ঝিনুক দেখিতে পাওয়া যায়, প্রচলিত ভাষায় তাহাকে 'শুক্তি' কহে। শুক্তি এক প্রকার জীব, জলে জন্মে বলিয়া ইহা জলজ জীবের মধ্যে পরিগণিত। এই জলজ জীবের উদরেই মুক্তা জন্মে। সুতরাং মুক্তা জীবজ পদার্থ, অর্থাৎ জীব হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। আমাদের অস্থি, কি দন্ত, যেমন ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায়, শুক্তির গর্ভে মুক্তা জন্মিয়া, তেমনই ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

পূর্ব্বে সকলের সংস্কার ছিল, মুক্তা এক প্রকার চেতন পদার্থ। জন্মিবার সময় শুক্তি ইহাকে ঢাকিয়া রাখে। কিন্তু এক্ষণে পণ্ডিতেরা

পরীক্ষা করিয়া, স্থির করিয়াছেন যে, মুক্তা চেতন পদার্থ নহে। শুক্তির দেহ-মধ্যে অস্থির ন্যায় এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়; এই পদার্থ জন্মিলে শুক্তিগণ অত্যন্ত বেদনা পায়, এজন্য দেহ হইতে এক প্রকার উজ্জ্বল বস্তু বাহির করিয়া, উহা আবরণ করে; এই আবৃত পদার্থই মুক্তা। এই আবরণ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং শুক্তির উদরের মুক্তা যত প্রাচীন হয়, ততই উহা বড় ও উজ্জ্বল হইয়া থাকে। কেহ কেহ কহেন, শুক্তির দেহ-মধ্যে বালুকা-কণা অথবা অপর কোন পদার্থ প্রবেশ করিলে, উহার বার বার গা চুলকাইতে ইচ্ছা হয়, এই চুলকান নিবারণ জন্য শুক্তি দেহ হইতে এক প্রকার স্বচ্ছ পদার্থ বাহির করিয়া, ঐ বালুকা-কণা প্রভৃতি আবৃত করে। কখন কখন অপর কোন জন্তু শুক্তির দেহের কোন স্থল বিদ্ধ করিলে, শুক্তি আপনার স্বাভাবিক শক্তি-বলে শরীর হইতে পূর্ব্বের ন্যায় পদার্থ বাহির করিয়া, ঐ বিদ্ধ স্থল ঢাকিয়া ফেলে। শুক্তির দেহ-নিঃসৃত এই পদার্থই পরিশেষে মুক্তা নামে প্রসিদ্ধ হয়। একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই শেষোক্ত উপায়ে মুক্তা

প্রস্তুত করিয়া, স্বদেশের রাজার নিকট প্রভূত সম্মান ও গৌরব-সূচক উপাধি প্রাপ্ত হন। চীন দেশের লোকেরাও অনেক কাল হইতে এই উপায় অবগত আছে। তাহারা জীবিত শুক্তি ধরিয়া, তাহার গাত্রে ছিদ্র করিয়া, ছাড়িয়া দেয়। ইহাতে অনেক শুক্তি নষ্ট হয় বটে, কিন্তু অনেকে আবার ঐ ছিদ্র ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য দেহ হইতে উজ্জ্বল পদার্থ বাহির করিয়া, মুক্তার উৎপত্তি করে। যে সকল মুক্তা, অল্প দিন শুক্তির উদরে থাকে, তাহার বড় আভা থাকে না, সুতরাং বাজারে মূল্যও অধিক হয় না। যাহা অধিক দিন শুক্তির উদরে থাকে, তাহা সাধারণ মুক্তা অপেক্ষা অনেক বড়, উজ্জ্বল ও মূল্যবান্। যে মুক্তা সাত বৎসর শুক্তির গর্ভে থাকে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট

সিংহল দ্বীপের সমুদ্র-তীরে মুক্তা পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত, পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর, এবং আমেরিকা খণ্ডে আট্‌লাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর প্রভৃতিতেও মুক্তা পাওয়া গিয়া থাকে। প্রতি বৎসর এই সকল স্থানে প্রায়

ষাটি লক্ষ শুক্তি ধৃত হইয়া, বিনষ্ট হয়। এই ষাটি লক্ষের দশ ভাগের এক ভাগ শুক্তিতে, মুক্তা পাওয়া যায়; অপর গুলিতে মুক্তা থাকে না।

প্রতি বৎসর বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে সিংহল দ্বীপের উপকূলে শুক্তি তোলা হয়। শুক্তি তোলা এক অদ্ভুত ব্যাপার। এই সময়ে বহু-সংখ্যক নৌকায় ও মুক্তা-ব্যবসায়ী নানাদেশীয় বণিক দিগের সমাগমে উপকূল-ভাগের অপূর্ব্ব শোভা হয়। যে দিন শুক্তি তুলিতে হইবে, তাহার পূর্ব্ব দিন, নাবিকেরা আড়ম্বরের সহিত দেবতার পূজা করে। পূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলে, তাহাদের আর আনন্দের অবধি থাকে না। কিন্তু যদি পূজার কোন রূপ ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে নানা রূপ আশঙ্কা করে। শুক্তি তুলিবার আদেশ জানাইবার নিমিত্ত, প্রত্যূষে একবার তোপ-ধ্বনি হয়। তোপ-ধ্বনি হইলেই, ডুবুরীরা আপন আপন নৌকা হইতে সমুদ্রের জলে নামে। প্রতি নৌকায় কুড়ি জন নাবিক ও একজন পথ-প্রদর্শক থাকে। এই কুড়ি জন নাবিকের মধ্যে দশ জন ডুব দেয়

শুক্তির মাংস পচিয়া গেলে মুক্তা বাহির করা হয়। ইহার পর বণিকেরা ঐ সকল মুক্তা কিনিয়া, উত্তম রূপে ধৌত করিয়া, নানা দেশে পাঠাইয়া দেয়। সিংহলের মুক্তার বাণিজ্য, এক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে আছে।

অপক্ক মুক্তা ধরিলে, সমুদয় মুক্তার বীজ নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে একবার গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী সিংহলে অপক্ক মুক্তা ধরিয়াছিলেন; সেই অবধি তথায় কুড়ি বৎসর মুক্তা জন্মে নাই। পরে ১৮৫৭ অব্দ হইতে যে সকল মুক্তা পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট, প্রতি বৎসর দুই লক্ষ টাকা পাইয়া আসিতেছেন।

পারস্য অখাতেও এইরূপে শুক্তি ধরা হইয়া থাকে। এই সকল মুক্তা 'বোম্বাই মুক্তা' নামে প্রসিদ্ধ। সিংহলের মুক্তা অপেক্ষা এই মুক্তার মূল্য অনেক কম। আমেরিকার পানামা, কালিফর্ণিয়া ও মেক্সিকো হইতে, এবং ইউরোপের স্কটলণ্ড, জার্ম্মনী, ফ্রান্স, সুইডেন ও রুসিয়া হইতে অনেক মুক্তা, ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়া থাকে। প্রতি বৎসর এইরূপে বহুসংখ্য শুক্তি ধরা

হইলেও, উহাদের বংশ বিলুপ্ত হয় না। প্রতি বৎসরেই উহাদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। যে সকল শুক্তি 'মুক্তা-জননী' নামে প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ যাহার ভিতর মুক্তা পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ের দৈর্ঘ্য এক প্রাদেশ, উপরিভাগ অত্যন্ত দৃঢ়, এবং কৃষ্ণ ও হরিদ্বর্ণ-বিশিষ্ট, কিন্তু মধ্যভাগে শুভ্র ও অন্যান্য বর্ণের আভা দেখিতে পাওয়া যায়।

সকল মুক্তার বর্ণ সমান নহে। ইহা শ্বেত, পীত, লোহিত ও কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা বর্ণের পাওয়া যায়। ইহার আকারও নানা প্রকার হইয়া থাকে। আসিয়াখণ্ডের মুক্তা শ্বেত, হরিদ্রা ও গৌর বর্ণ ভিন্ন, অন্য কোন বর্ণের হয় না। ইহার আকারও সর্ব্বতোভাবে গোল হইয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকার পানামা উপসাগরে যে সকল মুক্তা পাওয়া যায়, তাহা কৃষ্ণ অথবা ধূসর বর্ণ, এবং আকারে দীর্ঘ অথবা চেপ্টা হইয়া থাকে। ইউরোপীয়েরা শ্বেত-বর্ণ মুক্তার আদর করেন। আমাদের দেশের লোকে, পদ্মাভ ও চম্পক বর্ণ-বিশিষ্ট মুক্তাকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন।

বৃহৎ মুক্তা দুষ্প্রাপ্য। একশত রতি-পরিমিত

মুক্তা, পৃথিবীতে তিন চারিটী পাওয়া গিয়াছে। স্পেনের রাজা চতুর্থ ফিলিপের নিকট, এইরূপ একটী উৎকৃষ্ট মুক্তা আইসে; উহার মূল্য ষাটি হাজার টাকা। যে সকল মুক্তা শ্বেত-বর্ণ, সম্পূর্ণ গোল, দীপ্তিশালী ও কলঙ্কশূন্য, ইউরোপের মণিকারদিগের নিকট, তাহা সবিশেষ আদরণীয়। এক রতি-পরিমিত মুক্তার মূল্য অপেক্ষা, দুই রতি-পরিমিত মুক্তার মূল্য চারি গুণ অধিক, তিন-রতি পরিমিত মুক্তার মূল্য ষোল গুণ অধিক। এইরূপে পরিমাণ-ভেদে মুক্তার মূল্য অধিক হইয়া থাকে।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এক জন ভ্রমণকারী পারস্য দেশের রাজার নিকট একটী মুক্তা দেখেন। উহার দৈর্ঘ্য প্রায় তিন ইঞ্চ, এবং বেড় প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চ। এই মুক্তার মূল্য এগার লক্ষ টাকা। রোমের সম্রাট্ জুলিয়স্ সীজারের নিকট একটী মুক্তা ছিল, তাহার মূল্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। স্পেন প্রভৃতি দেশের রাজাদের নিকট যে যে মুক্তা দেখা গিয়াছে, তাহার মূল্য এক লক্ষ টাকারও অধিক হইবে।

কয়েক বৎসর হইল, মান্দ্রাজ নগরে কোন মেলায় একটী অদ্ভুত বস্তু আইসে। ইহার অর্দ্ধ-ভাগের আকার নারীর ন্যায় ও অর্দ্ধভাগের আকার মৎস্যের ন্যায়। মৎস্যাকার অংশ হরিদ্বর্ণ চুনি পাথরের আর নারীর আকারের মস্তক ও বাহু, শ্বেত চুনি পাথরের। একটী দীর্ঘাকার ও দুগ্ধবৎ শুভ্র জাপন-দেশীয় মুক্তায় ইহার বক্ষঃস্থল প্রস্তুত হইয়াছিল। এই মুক্তাটীকে অনেকে বহুমূল্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ।

দয়ার সাগর, প্রীতির আকর,
অখিল অবনী-স্বামী,
ভুবন-পালক, মঙ্গল-দায়ক,
জীবের অন্তরযামী।
সেই পরাৎপর, ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর,
ব্যাপ্ত চরাচরে যিনি।
যে কাজ গোপনে, কর হৃষ্ট মনে,
পাবেন, জানিতে তিনি।
কারো অগোচরে, যদি হর্ষ-ভরে,

পাপে কভু হও রত।
বিশ্ব-বিধাতার, নিকটে ইহার,
পাবে, শাস্তি বিধিমত।
করিয়া কুকাজে, মানব সমাজে,
যদি কভু সুখ হয়।
ঈশ্বরের হাতে, নিশ্চয় ইহাতে,
পাবে দুঃখ অতিশয়।
সুকাজ যতনে, করি কায়মনে
হও সুখী সর্ব্ব ক্ষণ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরে, জানিয়া অন্তরে,
কুকাজে দিও না মন।

স্বাস্থ্য।

স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। শরীর ভাল থাকিলে, মন ভাল থাকে; মন ভাল থাকিলে, সকল কাজ করিতে পারা যায়। যাহাদের শরীর ভাল নয়, যাহারা সর্ব্বদা রোগের যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহারা কোনও কাজ করিতে পারে না। তাহাদের কিছু মাত্র চেষ্টা, উদ্যম, উৎসাহ ও মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না। তাহারা সর্ব্বদা জীবন্ম-

তের ন্যায় পড়িয়া থাকে। যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে, তদ্বিষয়ে সকলেরই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। শরীর সুস্থ রাখাই, সকল ধর্ম্মের আদি। যাহারা স্বাস্থ্যের নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া, শরীর রুগ্ন করে, তাহারা ইচ্ছা করিয়া, অধর্ম্ম সঞ্চয় করে, এবং দয়াময় ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, তাঁহার নিকট অপরাধী হয়।

যত্ন করিয়া স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি প্রতিপালন করিলেই শরীর সুস্থ ও সতেজ থাকে। অতএব স্বাস্থ্যের নিয়ম মত চলিতে সকলেরই যত্ন করা উচিত। এ বিষয়ে অমনোযোগী হইলে, শরীর শীঘ্রই রুগ্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এবং নানা প্রকার যন্ত্রণা পাইয়া, কাল যাপন করিতে হয়।

প্রত্যূষে উঠিয়া, সর্ব্বাগ্রে শীতল জল দিয়া, চক্ষু, মুখ, ধৌত, ও দন্ত পরিষ্কার করা উচিত। শয্যা হইতে উঠিয়াই, পুস্তক লইয়া, পাঠ করিতে বসা উচিত নহে। আগে মুখ ধুইয়া, কিছুক্ষণ মাঠে বেড়ান উচিত, বেড়াইয়া আসিয়া, পড়িতে বসা কর্ত্তব্য। প্রত্যূষে রীতিমত বেড়াইলে, শরীর বিলক্ষণ সতেজ ও স্ফূর্ত্তি-যুক্ত থাকে। প্রাতঃ-

কালে নিদ্রা ভঙ্গ হইলেই, যাহারা বহি লইয়া বসে, তাহারা স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ে বড় অমনোযোগী। এই অমনোযোগ বশতঃ তাহাদের নানা প্রকার পীড়া হয়, সুতরাং আর তাহারা রীতিমত লেখা পড়া শিখিতে পারে না। অধিক ক্ষণ নিদ্রার পর, শীতল জল দিয়া, চক্ষু ধৌত করিলে চক্ষু সুস্থ থাকে। এই নিয়ম প্রতিপালন না করিলে, চক্ষের নানা প্রকার পীড়া জন্মে। প্রত্যহ সকাল বেলা মুখ ও দন্ত পরিষ্কার করিলে, মুখে দুর্গন্ধ হয় না, দন্ত বেশ পরিষ্কার ও সুদৃঢ় থাকে। দন্ত পরিষ্কার করিবার উপায় অতি সহজ। প্রত্যহ প্রাতঃকালে কয়লাচূর্ণ দিয়া মাজিলেই দাঁত বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়। কয়লার আর একটী গুণ এই যে, ইহা দুর্গন্ধ হরণ করে; সুতরাং ইহা দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করিলে, মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। কয়লা দিয়া মাজিয়া, আইস সেওড়া বা অন্য কোন কাঠের দাঁতন করিলে দন্তের পার্শ্বে আর কয়লার কুচি আটকিয়া থাকিতে পারে না।

প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে স্নান ও নিয়মিত সময়ে আহার করা উচিত। স্নানের সময়, অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ বেশ করিয়া পরিষ্কার করা বিধেয়, এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় হইলে কিছুক্ষণ সন্তরণ দেওয়াও যুক্তিসিদ্ধ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিষ্কৃত রাখিলে, পাঁচড়া প্রভৃতি ছোঁয়াচে রোগ জন্মিতে পারে না। সন্তরণ একটী উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। প্রত্যহ কিছুক্ষণ সাঁতার দিলে, হস্ত পদ, দৃঢ় ও বলশালী হয়। অনেকে বাজি রাখিয়া, অনবরত সাঁতার দিয়া থাকে। শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও বিরত হয় না। বাজি রাখিয়া, সাঁতার দেওয়া বড় দোষ। অনেকে এই রূপে অবিরত সাঁতার দিতে দিতে শেষে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া, জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

আমোদের সহিত গল্প করিতে করিতে আহার করা উচিত। ক্রুদ্ধ ও বিমর্ষ হইয়া, অথবা কোন বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, আহার করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে আহার্য্য বস্তু শীঘ্র পরিপাক পায় না। এই রূপে তাড়াতাড়ি আহার করাও নিষিদ্ধ। তাড়াতাড়ি আহার করিলেও অজীর্ণতা দোষ জন্মে। আহারের পর, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য। অনেকে তাড়াতাড়ি আহার করিয়াই,

বহি লইয়া, পাঠশালায় যায়। এরূপ করা বড় অন্যায়। ইহাতে নানা প্রকার পেটের পীড়ায়, শরীর শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়ে।

স্নান ও আহারের ন্যায় নিদ্রার সম্বন্ধেও যথোচিত নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। নিদ্রা, জীবের শ্রান্তি নিবারণ ও সন্তাপ হরণের প্রধান উপায়। যাহারা পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে, অথবা সন্তাপ ও শোকে নিরন্তর দগ্ধ হইতে থাকে, নিদ্রার প্রসাদে তাহারা শান্তি-সুখ ভোগ করে। জগদীশ্বর জীবদিগকে এই নিদ্রা-সুখের অধিকারী করিয়া, অপার করুণা ও মহিমার পরিচয় দিয়াছেন। ইচ্ছা করিয়া, নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইলে, করুণাময় ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। শীঘ্রই নানারূপ রোগ আসিয়া, এই অপরাধের সমুচিত শাস্তি প্রদান করে। প্রতি দিন, দশটার অধিক রাত্রি জাগরণ করা উচিত নহে। অনেকে পরীক্ষার সময়, কিম্বা নৃত্য গীতাদি আমোদে অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া থাকে। এরূপ রাত্রি জাগরণ নিতান্ত অনুচিত। দশটার অধিক রাত্রি জাগিলে যে

শরীর শুষ্ক ও রুগ্ন হয়, ইহা যেন সকলেরই বেশ মনে থাকে। যাহারা পরীক্ষার সময়, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, অধিক রাত্রি জাগরণ করে, তাহারা পাঠে সাতিশয় অমনোযোগী। দিবসে মনোযোগের সহিত পড়িলেই বেশ পড়া হয়, ইহার পর রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত পড়িলে, আর কোন বিষয়ে ভাবিতে হয় না।

সর্ব্বদা পরিষ্কৃত থাকা ও নিয়মিত সময়ে ব্যায়াম করা, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। অপরিষ্কৃত ও ময়লা পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত নহে। ধুতি, চাদর ও পিরাণ সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখা বিধেয়। অপরিষ্কৃত কাপড় ব্যবহার করিলে শরীরে ময়লা জন্মে, লোমকূপ সকল রুদ্ধ হয়, এবং সে জন্য নানা প্রকার চর্ম্মরোগ জন্মিয়া থাকে। ব্যায়াম করিলে অঙ্গ সকল সবল হয়; যাহারা ব্যায়াম ও পরিশ্রম করে না, তাহারা শীঘ্রই নিস্তেজ ও অসার হইয়া পড়ে। মুগুর ভাঁজা, সাঁতার দেওয়া, প্রাতঃকালে ও বৈকালে বেড়ান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম।

শিশুর দয়া।

দেখ মা ! দুয়ারে, ওই অন্ধ একজন
রয়েছে দাঁড়ায়ে, আহা ! বিষণ্ন বদনে,
জীর্ণ শীর্ণ রুগ্ন-কায় মলিন বদন,
কাতরে ডাকিছে সদা, ভিক্ষার কারণে।

ওর মত দুঃখী, এই পৃথিবী ভিতরে,
নাহি কেহ, দুটী চক্ষে না পায় দেখিতে,
কত যত্নে লাঠি ধরি, বেড়ায় বাহিরে,
কত কষ্ট হয় ওর, খাইতে পরিতে।

শীতল চন্দ্রমা, আর প্রখর তপন,
আছে আর যত দৃশ্য, বিশ্বে সুবিস্তার,
কিছুই করে না ওর, নেত্র বিমোহন,
স্বভাবের চারু শোভা, ঘোর অন্ধকার।

নাহি ওর পিতা মাতা, নাহি বন্ধু জন,
একাকী রয়েছে হায় ! আঁধারে পড়িয়া,
বড় দুঃখে, বড় কষ্টে, করে উপার্জ্জন,
প্রতিদিন মুষ্টি-ভিক্ষা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া।

কাপড় আমার কাছে, আছে এক খানি,
আর একটী সিকি, মা ! দিই গো উহারে,
নিরুপায় দুঃখী অন্ধ, কত সুখ মানি,
যাবে, কত আশীর্ব্বাদ করিয়া, আমারে।

আদরে শিশুর কথা শুনিয়া, জননী
চুম্বিয়া বদন তার, কহেন তখন,
জনম-দুঃখীরে ওই, দে রে যাদুমণি !
যাহা দিলে হয়, তোর আহ্লাদিত মন।

চির দিন যেন তোর, সরল অন্তরে,
এমন করুণা সদা থাকে বিকশিত,
চির দিন যেন ভাসি সন্তোষ-সাগরে,
করিস এমনি তুই, দরিদ্রের হিত।

শুনিয়া মায়ের কথা, আহ্লাদে তখন,
শিশু গিয়া, বস্ত্র সিকি, অন্ধ-হস্তে দিল।
লভিয়া অমূল্য দান, দুঃখী অন্ধ জন,
আনন্দ-সাগরে কত ভাসিতে লাগিল।

তুলি হাত, আশীর্ব্বাদ করিয়া তখন,
ফিরে গেল ঘরে অন্ধ, প্রফুল্ল হইয়া,

লভিল অমূল্য পুণ্য, এই শিশু জন,
নিরুপায় দুঃখী অন্ধে, দয়া প্রকাশিয়া

নারিকেল।

নারিকেল-বৃক্ষ ও নারিকেল-ফল, সকলেই দেখিয়া থাকে। কিন্তু ইহা দ্বারা মনুষ্যের যে কত উপকার হয়, তাহা অনেকেই জানে না। এই মহোপকারী বৃক্ষ আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অনেকেই দেখিয়াছে যে, যে গৃহে বাস করা যায়, তাহার পশ্চাতে এক একটী লৌহ শিক থাকে। এই শিক গৃহে বজ্র পতনের প্রতিবন্ধক। বজ্র ঘরে না পড়িয়া এই শিকের উপর পড়িয়া থাকে। নারিকেল বৃক্ষ দ্বারা এই রূপ শিকের কাজ হয়। গৃহের পশ্চাতে নারিকেল বৃক্ষ থাকিলে, আর সে গৃহে বাজ পড়িতে পারে না। নিকটে নারিকেল বৃক্ষ থাকিলে গৃহে বায়ুর গমনাগমনেরও কোন রূপ বাধা উপস্থিত হয় না। সুতরাং এই বৃক্ষ, গৃহের নিকট থাকিলে, যেমন বাজ পড়া বন্ধ হইতে পারে, তেমন গৃহে বিশুদ্ধ বায়ুও প্রবেশ করিতে পারে।

নারিকেল-ফল শরীরের পুষ্টি ও বল-বৃদ্ধি-কারক। ঝুন নারিকেল দুষ্পাচ্য বটে, কিন্তু ডাব সেরূপ নহে। ডাব খাইলে, শরীরে বলাধান হয়। ইহা ভিন্ন, নারিকেল দ্বারা অন্যান্য অনেক উপকার হইয়া থাকে। নারিকেলের তৈল চিরকাল প্রসিদ্ধ। ঔষধাদিতে ইহা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত নারিকেল-বৃক্ষে রজ্জু, দ্রব্যাধার প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় পদার্থ নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

আফ্রিকার নিকটে, ভারত মহাসাগরে, মিশেল ও মাহী নামে দুটী দ্বীপ আছে। তথায় এক প্রকার নারিকেল বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। উহা দরিয়ায়ী নারিকেল নামে প্রসিদ্ধ। এই নারিকেল-বৃক্ষ আমাদের দেশের নারিকেল গাছের ন্যায় স্থূল হয় বটে, কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রায় উহা দুইগুণ হইয়া থাকে। দরিয়ায়ী নারিকেল-বৃক্ষ, সচরাচর পঞ্চাশ হাত দীর্ঘ হয়। ইহার পত্র তাল-পত্রের ন্যায়, কিন্তু পরিমাণে, তাহা অপেক্ষা বড় হইয়া থাকে। পত্র সকল, সচরাচর দশ হাত দীর্ঘ ও আট হাত প্রশস্ত হয়। এক এক বৃক্ষে, এই পরিমাণের সত্তুর কি আশীটী পত্র একত্র থাকে।

সাধারণ নারিকেল ফল, ছয় মাসে পরিপক্ক হয়, সুতরাং এক এক বৎসর দুইবার করিয়া, এই সকল গাছের ফল পওয়া যায়। কিন্তু দরিয়ায়ী নারিকেল ফল, তেমন নয়। ইহা আট বৎসরে, পরিপক্ক হইয়া থাকে। প্রথম তিন বৎসরে, এই সকল ফল হরিদ্বর্ণ ও কোমল থাকে, পরিশেষে ক্রমে আঁসাল, দৃঢ় ও পরিপক্ক হইয়া, অষ্টম বর্ষে, বৃক্ষ হইতে ভূ-পতিত হয়। পরিপক্ক হইলে, এই ফল প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হইয়া থাকে। যদি দৈবাৎ কোন হতভাগার মাথার উপর পড়ে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এই নারিকেলের খোলে সাধারণতঃ ৭৷৮ সের জল ধরে। দশ সের জল ধরিতে পারে, এমন খোলও পাওয়া যায়। দৃঢ় ও লঘু বলিয়া, লোকে দুগ্ধ, তৈলাদি রাখিবার নিমিত্ত, এই খোল কলসের ন্যায় ব্যবহার করে। দরিয়ায়ী নারিকেল বৃক্ষে ঝুড়ী, মাদুর, টুপি, পাখা প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্ম্মিত হইয়া ব্যবহৃত হয়। এজন্য লোকে প্রতি বৎসর বহুসংখ্য বৃক্ষ ছেদন করিয়া থাকে।

সর্ব্বদা কু বিষয় ত্যাগ করা উচিত।

কু কাজ করোনা কভু, শুন দিয়া মন,
কু সঙ্গে থেকোনা কেহ, ভ্রমেও কখন,
কু ভাবনা ভাবিওনা বসিয়া বিরলে,
কু পুস্তক পড়িওনা আদরে সকলে।
কু কথা মুখেও কভু, এননা লজ্জায়,
কু রুচির পরিচয়, দিও না ধরায়।
কু ভাব কখন কেহ করোনা, প্রকাশ,
কু পথ্য করোনা হবে, রোগের বিকাশ॥
কু বিষয় সমুদায়, করিয়া বর্জ্জন,
সু বিষয়ে অবিরত দেও সবে মন।

পিতা মাতার প্রতি ব্যবহার।

পিতামাতা সন্তানদিগকে যেমন কষ্টে লালন, পালন ও শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সংসারে পিতা মাতার ঋণ পরিশোধ করা যায় না। আমরা যেরূপ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হই, তাহাতে পিতা মাতার দয়া ও স্নেহ না থাকিলে, আমাদিগকে শীঘ্রই

মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। দেখ, মাতা, আমাদিগকে দশ মাস উদরে ধারণ করিয়াছেন। তৎপরে, আমরা ভূমিষ্ঠ হইলে, আমাদের জন্য কত যত্ন ও কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। জন্ম গ্রহণের পর, যখন আমাদের কথা কহিবার শক্তি থাকে না, উঠিবার ক্ষমতা থাকে না, আহার সামগ্রী বা গাত্র-বস্ত্র সংগ্রহের উপায় থাকে না, তখন এক মাত্র মাতার স্নেহ ও করুণাই আমাদিগকে অকাল-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে। সন্তান শত বৎসর সেবা শুশ্রূষা করিয়াও, মাতার এই দয়া ও স্নেহের ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না।

সন্তান যেমন অবস্থার হউক না কেন, মাতার নিকট তাহা অমূল্য রত্ন স্বরূপ। সন্তান কুরূপ, অঙ্গহীন বা ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও, মাতার যত্ন ও স্নেহের কিছুমাত্র ত্রুটী দেখা যায় না। মাতা এরূপ অবস্থাপন্ন সন্তানকেও, অতি আদর ও স্নেহের সহিত পালন করিয়া থাকেন। দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান যখন পীড়িত হয়, তখন জননী যে, পীড়িতের ন্যায় কার্য্য করেন, এবং স্বীয় দেহ-

নিঃসৃত দুগ্ধ দ্বারা যে, অনুক্ষণ তাহার পুষ্টিসাধনে ব্যাপৃত থাকেন, তাহা কে না জানে? ফলে, সন্তানের লালন পালন সম্বন্ধীয় প্রতি কার্য্যেই, স্নেহময়ী জননীর অনুপম স্নেহ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এরূপ স্নেহ ও প্রীতির দৃষ্টান্ত, আর কোথাও নাই!

সন্তান কিছু বড় হইলে, তাহার বিদ্যাশিক্ষা ও চরিত্র শোধনের জন্য, পিতাকে যার পর নাই পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সন্তান যাহাতে সুশিক্ষিত ও সংসারের উপযুক্ত হয়, তাহার নিমিত্ত, পিতা সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন। সন্তান সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও যশস্বী হইলে, পিতার আর আহ্লাদের অবধি থাকে না। লোকমুখে সন্তানের সুখ্যাতি শুনিলে, পিতার অন্তঃকরণ আনন্দে নাচিতে থাকে। এমন পরম হিতৈষীর প্রতি সন্তানের কি রূপ কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না।

ফলে পিতা মাতা, সন্তানের নিকট প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ। কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের আদেশ পালন করা উচিত। পিতা মাতা যদি কখন

সন্তানকে কোন কঠোর কথা কহেন, তাহা হইলেও, বিরক্ত কি ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাদের অসম্মান করা উচিত নহে। তাঁহারা বিদ্বেষ বশতঃ কি সন্তানের অনিষ্ট কামনায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। সন্তানের মঙ্গল সাধনই তাঁহাদের সকল কার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহাদের কোন কঠোর ভাব দেখিয়া, হঠাৎ বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

পিতা মাতা অশিক্ষিত হইলেও, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা এবং আজ্ঞাবহ সেবকের ন্যায়, তাঁহাদের শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। পিতামাতা যখন অশিক্ষিত হইয়াও, সন্তানদিগকে সুশিক্ষিত ও সংসারের উপযুক্ত করিতে যত্ন করেন, তখন তাঁহাদের ন্যায় হিতকারী ব্যক্তি পৃথিবীর কোথাও নাই। সুশিক্ষিত হইয়া, এই হিতকারী ভক্তিভাজনকে অশ্রদ্ধা কি অবজ্ঞা করা, বড় অসঙ্গত ও অধর্ম্মকর। পিতা মাতা যখন বৃদ্ধ হইয়া, কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন, তখন সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করা, সন্তানের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বৃদ্ধাবস্থায় মনের ভাব ক্রমে

নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই নিস্তেজ অবস্থায়, জনক জননী যদি না বুঝিয়া, সন্তানের প্রতি কোন বিষয়ে ক্রোধ প্রকাশ করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত হওয়া উচিত নহে। বৃদ্ধ জনক জননীকে পরিত্যাগ করিয়া, স্বয়ং নানা প্রকার সুখ ভোগ করা অপেক্ষা বিষ পান করাই শ্রেয়ঃ। সন্তান যখন নিরুপায় ও কার্য্যে অক্ষম থাকে, তখন জনক জননী যেমন প্রাণপণে তাহাকে প্রতিপালন করেন, জনক জননী যখন বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ হইয়া কার্য্যে অসমর্থ হন, তখন তেমনি প্রাণপণে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করা, ভক্তিপরায়ণ সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জগদীশ্বর নিরুপায় শিশু সন্তানকে জনক জননীর হস্তে, এবং নিরুপায় জনক জননীকে সন্তানের হস্তে সমর্পণ করিয়া, অপূর্ব্ব কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বরের এই কৌশলের প্রতি যে তাচ্ছীল্য দেখায়, সে সংসারে মহাপাপী। কোন কালেও সে এই মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ পায় না।

চেষ্টা।

কেন ভীরু। মলিন বদন ?
সাহসে করিয়া ভর, কাজে হও অগ্রসর,
পাবে ফল অবশ্য কখন।

কেন ক্ষুণ্ণ, তুমি কর্ণধার ?
দৃঢ় মনে প্রাণপণে, ধর হাল সুযতনে,
তরিবে হে, জলধি এবার।

কেন পান্থ ! বসিয়া বিরলে
ভাবিতেছ অবিরত ? আবার হাঁটিতে রত
হও, যাবে আপনার স্থলে।

কেন ভাব ডুবুরী ! এমন ?
এক মনে চেষ্টা-ভরে, ডুব ওই রত্নাকরে,
হবে লাভ অবশ্য রতন।

কেন আছ বিষয়ী সুজন !
ক্ষতি দেখি ক্ষুণ্ণ মনে ? চেষ্টা কর প্রাণপণে,
ধন লাভ হইবে এখন।

কেন শিশু ! এত উচাটন ?
কর পাঠ চেষ্টা-বলে, চেষ্টা বিনা এ ভূতলে,
কোন কাজ, হবে না কখন।

সমুদ্র।

পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, পৃথিবীতে স্থলের ভাগ অপেক্ষা জলের ভাগ প্রায় তিন গুণ অধিক। এই জল-ভাগ মহাসাগর, সাগর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভক্ত হইয়াছে। যে বিস্তীর্ণ জল-রাশি পৃথিবীর চারি দিকে রহিয়াছে, তাহাকে মহাসগর কহে। মহাসাগরের ক্ষুদ্র অংশের নাম সাগর। এস্থলে মহাসাগর, সাগর প্রভৃতিকে সাধারণতঃ সমুদ্র নামেই উল্লেখ করা যাইতেছে।

সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতির ন্যায় সমুদ্রেও জগদীশ্বরের অপার মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। সূর্য্য যে পরিমাণে উত্তাপ দিতেছে, অথবা বায়ু যে পরিমাণে পৃথিবীতে প্রবাহিত হইতেছে, যদি তাহার কিছু ন্যূনাধিক্য হইত, তাহা হইলে এই ভূমণ্ডল কখনই জীব-সমূহের আবাস-যোগ্য হইত না। এইরূপ সমুদ্রে যে পরিমাণে জল আছে, তাহার কিঞ্চিৎ অল্পতা বা আধিক্য হইলে,

ভূভাগ একবারে মরুভূমি তুল্য, অথবা সমুদ্রে নিমগ্ন হইত। কিন্তু ঈশ্বরের কি অপার করুণা! সূর্য্যের উত্তাপ ও বায়ুর প্রবাহের ন্যায়, সমুদ্রের জলও সমান অবস্থায় রহিয়াছে। বৃষ্টি বা নদীর স্রোতে যখন সমুদ্রের জল বৃদ্ধি পায়, তখন জলের সেই অতিরিক্ত অংশ বাষ্পের আকারে শীঘ্রই শূন্যে উঠিয়া যায়, সুতরাং সমুদ্রের জল পূর্ব্বের ন্যায় সমান অবস্থায় থাকে। চারিদিকে সমুদ্র থাকিলেও জলের এই সমান অবস্থার জন্য পৃথিবীর কোন অনিষ্ট হয় না।

অনেকের বিশ্বাস, সমুদ্র অতল-স্পর্শ, অর্থাৎ সমুদ্রের গভীরতা এত অধিক যে, কোন প্রকারে ইহার তল-দেশ স্পর্শ করিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ সমুদ্র অতল-স্পর্শ নহে। সমুদ্রের গভীরতা গড়ে আড়াই ক্রোশের অধিক হইবে না। কোন কোন স্থলে, সমুদ্রের গভীরতা সাত মাইলও হইয়া থাকে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান পর্ব্বতের উচ্চতা অপেক্ষাও সমুদ্রের গভীরতা অধিক। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান পর্ব্বত পাঁচ মাইলের অধিক উচ্চ নহে।

নাবিকেরা সমুদ্রের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, স্থির করিয়াছেন, সমুদ্র-জলের স্বাভাবিক বর্ণ নির্ম্মল আকাশের ন্যায় নীল। স্থল-বিশেষে সমুদ্রের জল শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত প্রভৃতি নানা রঙ্গের দেখা যায়, কিন্তু উহা সমুদ্র-জলের স্বাভাবিক বর্ণ নহে। সমুদ্রে যে সমস্ত বালুকা, উদ্ভিদ্ ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট থাকে, তাহারই বর্ণ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে, সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হইয়া থাকে। ১৮১৬খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন টকি সাহেব মধ্য আফ্রিকায় গমন করেন। যখন তিনি তথা হইতে স্বদেশে আসিতে ছিলেন, তখন গিনি উপসাগরের জলের শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়া, লিখিয়াছিলেন, "আমি যখন এই স্থলে উপস্থিত হইলাম, তখন জল ঈষৎ শুভ্রবর্ণ বোধ হইল। পরে কিছু দূরে গেলে, আমার চারিদিকে শ্বেত-বর্ণ জল-রাশি দেখা যাইতে লাগিল"।

আমেরিকা খণ্ডে 'ব্রেজিল' নামে একটী দেশ ও আসিয়া খণ্ডে 'চীন' নামে একটী দেশ আছে। এই দুই দেশের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের জল গাঢ় লোহিত-বর্ণ। উত্তর মহাসাগর ও ভূমধ্য-সাগরের

স্থান-বিশেষের জলও এই রূপ লোহিত-বর্ণ দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত, সমুদ্রের জল কৃষ্ণ, হরিৎ, পীত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এক জন সুশিক্ষিত নাবিক, সাগরের শুভ্র-বর্ণ জল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, উহাতে শুভ্র-বর্ণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট সকল বেড়াইতেছে। এই শুভ্র কীট সকলই উক্ত জলের শুভ্রতার কারণ। এইরূপ লোহিতবর্ণ ও পীতবর্ণ কীটাণু-সমূহের সংযোগে, সমুদ্রের জল লোহিত ও পীত বর্ণ হয়। তিমি মৎস্য-ব্যবসায়িগণ কহে, তিমি মৎস্য এক প্রকার হরিদ্বর্ণ কীটাণু ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই তিমি মৎস্য, সমুদ্রের হরিদ্বর্ণ জল রাশিতেই পাওয়া যায়। সমুদ্রের যে অংশের জল, আকাশের ন্যায় নীল-বর্ণ, সেখানে এই মৎস্য পাওয়া যায় না। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাই-তেছে যে, সমুদ্রের জল স্বভাবতঃ হরিদ্বর্ণ নহে, কেবল হরিদ্বর্ণ কীটাণু থাকাতেই, উহা হরিদ্বর্ণ হইয়া থাকে।

যেখানে কীটাণু নাই, সেখানে বালুকা ও উদ্ভিদ্ প্রভৃতি দ্বারা সমুদ্র-জলের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ

হইয়া থাকে। স্কর্বি নামে এক জন সুদক্ষ নাবিক কহেন, সমুদ্রের যে অংশ অল্প গম্ভীর, সেই অংশের নিম্নস্থিত উজ্জ্বল বালুকার আভায়, উপরের জল হরিদ্বর্ণ দেখা যায়, এবং জলের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে এই বর্ণের গাঢ়তা ও অল্পতা হইয়া থাকে। এইরূপে সমুদ্রের তলায় লোহিত বা কৃষ্ণবর্ণ বালুকা, কর্দ্দম ও পর্ব্বত প্রভৃতি থাকিলে, জলও লোহিত, কৃষ্ণ, পিঙ্গল, হরিৎ প্রভৃতি নানা প্রকার বর্ণের হয়।

মেঘের প্রতিবিম্ব সমুদ্রের জলে পড়িলেও, উহার বর্ণ অন্য রূপ হয়। ঝড়ের পূর্ব্বে, আকাশ যখন কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আবৃত হয়, তখন সমুদ্রের জলও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। এই কৃষ্ণবর্ণ সাগরের জলের প্রকৃত বর্ণ নহে; ইহা উপরিস্থ মেঘের ছায়া মাত্র। এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন মেঘের প্রতি-বিম্বে, সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হয়।

কাক ও শৃগাল।

একখণ্ড মাংস মুখে, হৃষিত হইয়া,
কাক এক, বৃক্ষ-ডালে বসিল আসিয়া।

নীচেতে বসিয়াছিল একটী শৃগাল,
কাকমুখে মাংস-খণ্ড দেখিয়া রসাল,
খাইতে বাসনা তার হইল অন্তরে,
" কিরূপে সুমিষ্ট মাংস অতি হর্ষভরে
খাইব, এখন আমি কাকে ফাঁকি দিয়া "
ভাবিতে লাগিল, ধূর্ত্ত তলায় বসিয়া।
নাহিক ক্ষমতা কিছু, বৃক্ষ আরোহণে,
উড়িবার শক্তি নাই, বায়সের সনে।
তথাপি বঞ্চনা বলে সে বঞ্চকবর,
পূরাতে মনের বাঞ্ছা, হইল সত্বর।
কিছুক্ষণ ভাবি, পরে কাকে সম্বোধিয়া,
কহিল শৃগাল, মৃদু হাসিয়া হাসিয়া।
" হে কাক ! তোমার রূপ হেরিয়া আমার,
মোহিত হইল মন, কহিব কি আর।
মূঢ় আমি, দীন হীন এই ধরাতলে,
না জানি করিতে স্তব কথার কৌশলে।
নাহি বিদ্যা, নাহি বুদ্ধি, নাহিক শকতি,
তব স্তুতি গান করি, পাইতে মুকতি।
রূপে গুণে কেহ নয়, তোমার সমান,
সর্ব্ব স্থানে করে সবে, তব গুণ গান।

তোমার মধুর স্বর মরি কি কোমল,
শুনিলে জুড়ায়, সদা শ্রবণ যুগল।
শুনিয়াছি কত শত বংশীর সুরব,
শুনিয়াছি আর আর পাখীদের রব।
শুনিয়াছি মানবের গীত মনোহর,
কিন্তু তব স্বর কাছে, হে বায়স-বর !
এ বিপুল ধরাতলে, যে সকল ধ্বনি,
মনে মনে আমি সদা, অতি তুচ্ছ গণি।
শাখায় বসিয়া যবে, কর তুমি গান,
জুড়ায় তখন বিশ্বে, সবার পরাণ।
একবার স্নিগ্ধ স্বরে দয়ার সাগর !
জুড়াও আমার এই, তাপিত অন্তর।
সর্ব্বস্থানে দেখি আমি, তোমার সম্মান,
উদারতা-গুণে তুমি, বিহঙ্গ-প্রধান।
কাতর অন্তরে তেঁই করি হে বিনতি,
মিটাও দাসের সাধ, দীন হীন অতি।
শৃগালের স্তবে তুষ্ট, বায়স যেমনি
"কা কা" বলি হর্ষ-ভরে ডাকিল, অমনি
মুখ হতে মাংস-খণ্ড, তলায় পড়িল,
আনন্দে শৃগাল তাহে খাইতে লাগিল।

খলের স্বভাব কাক তখন বুঝিয়া,
উড়ে গেল অন্য স্থানে, দুঃখিত হইয়া।
আপাত মধুর কথা, বলে খল জন,
করো না তাহাতে কভু, বিশ্বাস স্থাপন।

ভ্রাতা ভগনী ও বন্ধুজনের প্রতি ব্যবহার।

ভ্রাতা ভগিনী, আমাদের নিতান্ত প্রীতির পাত্র। আমরা যাহাদের সহিত এক পিতা ও এক মাতার স্নেহে, পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, একত্র আহার বিহার, ও শয়ন উপবেশন করিয়াছি, এবং একত্র এক স্থানে থাকিয়া এক আমোদে আমোদিত হইয়াছি, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করা যে, আমাদের কতদূর কর্ত্তব্য, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পিতা মাতা আপনার সন্তানগুলিকে পরস্পর স্নেহ ও প্রীতিতে আবদ্ধ দেখিতে ভাল বাসেন। যদি উহারা বিনা বিবাদে কাল যাপন করে, তাহা হইলে পিতা মাতার আর আহ্লাদের সীমা

থাকে না। জনক জননী যখন সন্তান গুলির মধ্যে সদ্ভাব দেখিলে আনন্দিত হন, তখন যাহাতে ভ্রাতা ও ভগিনীদের মধ্যে সেই সদ্ভাব ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায়, সে বিষয়ে সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য।

সহোদর ও সহোদরাদের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহ ও প্রীতি দেখাইলে, অনেক পারিবারিক সুখ পাওয়া যায়। যে পরিবারে ভাই ভগিনীদের মধ্যে বিবাদ হয়, সে পরিবারে কিছু মাত্র সুখ ও শান্তি থাকে না। সর্ব্বদা আত্মকলহে সে পরিবার শীঘ্রই উৎসন্ন হইয়া যায়। দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে পরিবার-বদ্ধ করিয়া যে সুখের অধিকারী করিয়াছেন, বিবাদ বিসম্বাদে সে সুখ নষ্ট করা বড় অন্যায়। যদি ভাই ভগিনীগুলি পরস্পর সদ্ভাবে কাল যাপন করে, তাহা হইলে তাহারা যেমন মনের সুখে থাকে, অন্য কোন উপায়ে তেমন মনের সুখে থাকিতে পারে না। ভাই ও ভগিনী দিগের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহ প্রকাশ ও সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পরস্পর কলহ করিয়া কাল যাপন করা উচিত নহে। আত্মকলহে অনেক বিপদ হইয়া থাকে।

ভ্রাতা ও ভগিনী দিগের প্রতি যেরূপ স্নেহ ও প্রীতি প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, বন্ধুদিগের প্রতি ও সেইরূপ স্নেহ ও প্রীতি দেখান উচিত। সচ্চরিত্র ও হিতৈষী বন্ধু আমাদের পরম আদরের পাত্র। বন্ধু জনের নিকট মন খুলিয়া, সকল কথা বলিতে পারা যায়, যে সকল কথা জনক জননী অথবা ভাই ভগিনীর নিকট বলিতে পারা যায় না, তাহাও বন্ধুর নিকট কহিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ উপস্থিত হয় না। কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে অকৃত্রিম সুহৃৎ সেই বিপদ হইতে বন্ধুকে রক্ষা করিতে, যার পর নাই চেষ্টা পাইয়া থাকে। এমন সদাশয় বন্ধুকে কখনও অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

অনেকে একপাঠিদের সহিত সর্ব্বদা কলহ করিয়া থাকে। এরূপ করা নিতান্ত অন্যায়। সমপাঠী বন্ধুদের সহিত সদ্ভাব রাখা উচিত। পাঠশালায় সমপাঠিদের সহিত কলহ করিলে, পাঠের অনেক ব্যাঘাত হয়, শিক্ষক মহাশয় কলহকারী ও দুর্ব্বিনীত বলিয়া, তাহাকে আর ভাল বাসেন না, সমপাঠীরাও বিরক্ত হইয়া, তাহার সহিত মিশিতে

চায় না। কিন্তু যাহারা একপাঠিদের সহিত সদ্ভাবে কাল যাপন করে, সরল অন্তঃকরণে ও প্রীতির সহিত সদ্ব্যবহার করে, সুশীল ও শান্ত বলিয়া, শিক্ষক মহাশয় তাহাদিগকে বড় ভাল বাসেন এবং যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা দেন। সরল স্বভাবের জন্য, তাহাদের বড় সুখ্যাতি হয়।

উপদেশ।

সুশীল বিনয়ী হ'লে, পাবে সুখ ধরাতলে,
সুজন সুবোধ বলি, কত লোকে মানিবে।
ক'লে সদা সত্য কথা, নাহি পাবে কোন ব্যথা,
সত্যবাদী বলি লোকে, কত ভাল বাসিবে।
সুযতনে কায়মনে, উপার্জ্জিলে বিদ্যা-ধনে,
সমাদরে এ ভুবনে, সুখে কাল কাটিবে।
ঈশ্বরে ভকতি করি, দুঃখিদের দুঃখ হরি,
যাপিলে সময় নিত্য, কত পুণ্য হইবে।
প্রিয়তম গুরু-জনে, সেবা করি কায়মনে,
মানিলে তাঁদের কথা, কত ফল পাইবে।
হয়ে সদা অবহিত, করিলে দেশের হিত,

চিরদিন তব নাম, ধরাতলে থাকিবে।
সোদর সোদরা সনে, থাকিলে প্রফুল্ল মনে,
আদরে সকল জনে, কত গুণ ঘুষিবে।
হিংসা, দ্বেষ পরিহরি, ভাই, বলি যত্ন করি,
সবারে বাসিলে ভাল, কত যশ লভিবে।

চন্দ্র।

আমরা চন্দ্রকে একখানি উজ্জ্বল থালের ন্যায়, দেখিতে পাই। বস্তুতঃ উহা একটী প্রকাণ্ড গোলাকার পদার্থ। পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে বলিয়া, একখানি থালার মত, ক্ষুদ্র দেখায়। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, চন্দ্র পৃথিবী হইতে দুই লক্ষ, সাইত্রিশ হাজার, ছয় শত সাতাইস ক্রোশ দূরে থাকিয়া, গড়াইতে গড়াইতে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। এই পরিভ্রমণ, অতিশয় বেগে হইতেছে। চন্দ্রের গতি, প্রতি মিনিটে ৩৮ ক্রোশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঘোড় দৌড়ের ঘোড়া, দুই মিনিটে এক ক্রোশ যায়। ইহার তুলনায়, চন্দ্র ৭৬ গুণ অধিক বেগে ঘুরিতেছে। চন্দ্রের ব্যাস, দুই হাজার, একশত তিপ্পান্ন

ক্রোশ, এবং উহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের চারি ভাগের এক ভাগ।

সূর্য্যে যেমন দীপ্তি আছে, চন্দ্রে তেমন দীপ্তি নাই। উহা আভাহীন পদার্থ। সূর্য্যের আলোক চন্দ্রে পড়িলেই, চন্দ্র তেজোময় হয়। যদি সূর্য্যের আলোক চন্দ্রে না পড়িত, তাহা-হইলে রাত্রিকালে চন্দ্র দ্বারা কখনই অন্ধকার দূর হইত না। একখানি দর্পণ রৌদ্রে ধরিলে দেখা যায় যে, রৌদ্র ঐ দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া, সম্মুখের প্রাচীর আলোকিত করে। সূর্য্যের আলোকও, চন্দ্রে ঐ রূপ প্রতিফলিত হইয়া, পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়া থাকে।

পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রমণ্ডলও নিতান্ত অসম; পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রেও পর্ব্বত, গহ্বর প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। চন্দ্রের কোন কোন পর্ব্বত, হিমালয় পর্ব্বত অপেক্ষাও উচ্চ। কোন কোন স্থানে ভীষণ মরুভূমি নিরন্তর ধূ ধূ করিতেছে। চন্দ্রে যে কাল চিহ্ন দেখা যায়, তাহা আর কিছু নহে; কেবল সূর্য্যের কিরণ, চন্দ্রের সকল স্থানে মান ভাবে প্রবেশ করিতে না পারাতে ঐ

সকল চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হই-য়াছে, চন্দ্রের দেহ সমান নয়। ইহার কোন স্থানে ভীষণ অরণ্য, কোন স্থানে ভীষণ গিরি-গুহা, কোন স্থানে বা ভীষণ মরুভূমি রহিয়াছে। সূর্য্যের কিরণ, এই সকল স্থানে সমান ভাবে প্রবেশ করিতে পারে না। চন্দ্রের যে সকল স্থান অধিক উচ্চ, সূর্য্যের কিরণ সেই সকল স্থানে অধিক উজ্জ্বল হয়, এবং যে সকল স্থান অধিক নিম্ন, সেই সকল স্থান অল্প উজ্জ্বল হইয়া থাকে। এই অল্প দীপ্তি-যুক্ত স্থানগুলিকেই, চন্দ্রের 'কলঙ্ক' বলা যায়।

কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, চন্দ্রে জল ও বায়ু কিছুই নাই। সুতরাং উহাতে কোন প্রাণীর আবাসও নাই। কেহ কেহ আবার কহেন, পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্র-মণ্ডলেও, জল, বায়ু ও প্রাণী প্রভৃতি আছে। এই দুই মতের মধ্যে কোন্ মত সত্য, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য।

পৃথিবী যেমন এক বৎসরে সূর্য্যের চারি-দিক, এক বার করিয়া, ঘুরিয়া আইসে; চন্দ্রও সেইরূপ সাতাইস দিন, সাত ঘণ্টা, তেতা-

ত্রিশ মিনিটে, পৃথিবীকে এক বার পরিবেষ্টন করে। এই জন্য পৃথিবী হইতে সকল সময় চন্দ্রের সমান অবস্থা দেখা যায় না। সূর্য্যের কিরণে চন্দ্রের অর্দ্ধ অংশ নিয়ত দীপ্তি পাইতে থাকে। ঘুরিতে ঘুরিতে, চন্দ্রের এই দীপ্তিমান্ অর্দ্ধ ভাগ যখন পৃথিবীর দিকে আইসে, তখন আমরা সেই অর্দ্ধ ভাগ, সমুদয় দেখিতে পাই। এই অর্দ্ধ ভাগকে পূর্ণ চন্দ্র বলা যায়। আবার, যখন সেই দীপ্তিযুক্ত সমস্ত ভাগ, পৃথিবীর দিকে না থাকে, তখন আমরা অংশ অংশ দেখিতে পাই। এই দীপ্তিমান্ অংশকে চন্দ্রকলা নামে নির্দ্দেশ করা যায়। ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র যখন এমন স্থানে উপস্থিত হয় যে, উহার আলোকিত ভাগ পৃথিবী হইতে দেখা যায় না; তখন আমরা চন্দ্র দেখিতে পাই না। এই সময়কে অমাবস্যা কহে। পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রমণ্ডলেও দিন ও রাত্রি হইয়া থাকে। এই দিন ও রাত্রি পোনের দিন করিয়া থাকে (১)।

পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রেও অনেক আগ্নেয় গিরি

(১) শিক্ষক মহাশয়, একটী গোলক লইয়া, এবিষয়ে শিক্ষা দিলে, ছাত্রগণ সহজে বুঝিতে পারিবে।

আছে। এই সমস্ত আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে সময়ে সময়ে ধূম, অগ্নিশিখা প্রভৃতি উঠিয়া থাকে। আমরা যে পরম শোভাকর চন্দ্র দেখিয়া, পুলকিত হই, যে চন্দ্র স্নিগ্ধ কিরণ দ্বারা, আমাদের তাপিত দেহ শীতল করে, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর সে রমণীয় চন্দ্রেও ভয়ঙ্কর আগ্নেয় গিরি ও মরুভূমি প্রভৃতি সৃজন করিয়া, আপনার অনন্ত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

জন্ম ভূমি।

প্রিয়তম জন্মভূমি প্রীতি-নিকেতন
কত সুখ হয় যারে করিলে দর্শন।
স্বর্গ হতে হয় বড় যাহার সম্মান
জনম-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
যদিও জনম-ভূমি হয় শোভা-হীন,
না থাকে নিসর্গ-দৃশ্য সুন্দর নবীন;
তথাপি তাহাও কিবা সুখের নিধান;
জনম-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান?
সুখময় শান্তিময় জনম-ভবন
পায় না এমন সুখ-শান্তি-নিকেতন।

বহুমূল্য রত্ন লোকে করিলে প্রদান,
জনম-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?

জনম-ভূমির তরে কত বীরবর
ত্যজিয়াছে অকাতরে আত্মকলেবর,
সর্ব্বস্থলে ধরাতলে তাদের সম্মান,
জনম-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?

জনম-ভূমির গুণ যত কবিগণে
মধুর সঙ্গীতে ব্যক্ত করেন ভুবনে।
সে মধুর গানে. গলে কঠিন পরাণ।
জনম-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান।

নাহি আর ধরাতলে পবিত্র নির্ম্মল
জনম-ভূমির কোন উপমার স্থল।
করে না কিছুতে আর সন্তোষ বিধান ;
জনম-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?

জনম-ভূমিরে সদা আনন্দিত মনে
'স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলি, বুধগণে
বাড়ান আদর তার, বাড়ান সম্মান।
জনম-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?

প্রীতির আধার এই, সন্তোষ-আগার
জনম-ভূমিতে যেন থাকে সবাকার,
নিয়ত আদর, স্নেহ, মমতা সমান।
জনম-ভূমির তুল্য নাহি কোন স্থান।

বিদ্রূপকারী পক্ষী।

আফ্রিকা ও আমেরিকায় এক প্রকার পক্ষী আছে। ইহার দেহের পরিমাণ, আমাদের দেশের শালিক পক্ষীর ন্যায়; কখন কখন ছোট ছোট কাকের ন্যায়ও হইয়া থাকে। পক্ষ ও পুচ্ছ ধূসর বর্ণ; উহার উপর কিছু কিছু শ্বেতের আভা দেখা যায়। ভ্রূদেশ ও বক্ষঃস্থল, ঈষৎ শুভ্র হয়। মস্তকে একটী ক্ষুদ্র শিখা জন্মে। চঞ্চুর অগ্রভাগ কিছু বক্র ও নাসিকা পালকে আচ্ছাদিত দেখা যায়। চঞ্চু ও পদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ, এবং চক্ষু পিঙ্গল-বর্ণ হয়। এই পক্ষী, নয় বুরুল হইতে দশ বুরুল পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে।

জগদীশ্বর এই সামান্য পক্ষীকে এক অসাধারণ ক্ষমতা দিয়াছেন। এই পক্ষী, আপনার ইচ্ছা অনুসারে, সকল জীবের স্বরেরই অনুকরণ করিতে পারে।

এই অনুকরণ এমন দোষশূন্য হয় যে, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকে। হরিণগণ, পালে পালে বেড়াইতেছে দেখিয়া, এই পক্ষী অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া, হঠাৎ সিংহের ন্যায় এমন অবিকল গর্জ্জন করে যে, তাহাতে মৃগ সকল যথার্থই সিংহ আসিতেছে ভাবিয়া, ভয়ে এদিকে ওদিকে পলায়ন করে। এইরূপ কপোত সকলকে একত্রে আনন্দে ক্রীড়া করিতে দেখিলে, এই পক্ষী শ্যেন পক্ষীর রবের অনুকরণ করিয়া, সকলকে দলভ্রষ্ট করিয়া দেয়। ইহা ভিন্ন এই পক্ষী, গর্দ্দভ প্রভৃতির রবেরও অনুকরণ করিতে পারে। এই রূপ অনুকরণ-বলে, অপরাপর জীবের সহিত বিদ্রূপ করে বলিয়া, ইহাদিগকে বিদ্রূপকারী পক্ষী বলা যায়।

এই সকল পক্ষী, ক্ষেত্রে ও নিবিড় পত্র আচ্ছাদিত বৃক্ষে বাস করে। মনুষ্যদিগকে ইহারা অতিশয় ভয় করে। কিঞ্চিৎ আশঙ্কা উপস্থিত হইলেই, শীঘ্র শীঘ্র ঝোপের মধ্যে গিয়া লুকায়। এই পক্ষী, মাংস ও উদ্ভিদ্ উভয়ই ভক্ষণ করিয়া, প্রাণ ধারণ করে। গুটিপোকা, উই, গোবরা-

পোকা, মটর, শিম, কপির ফুল ইহাদের প্রধান আহার। বন্য কুক্কুট প্রভৃতির অণ্ডও ইহাদের উপাদেয় খাদ্য। ইহারা এই অণ্ড খাইবার লোভে, পাখীদের কুলায় অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। এই পক্ষী ধরিবার ইচ্ছা হইলে, একটী পেচককে রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, তাহার নিকটে একটী ফাঁদ পাতিয়া রাখিতে হয়। পেচকদিগের সহিত ইহাদের এরূপ স্বভাব-সিদ্ধ শত্রুতা যে, উহাদিগকে রজ্জু-বদ্ধ দেখিলেই, ইহারা চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিতে আইসে, সুতরাং অনায়াসে ফাঁদে পড়িয়া যায়।

এই পক্ষী প্রতি বৎসর, দুইবার অণ্ড প্রসব করে। এই অণ্ড এককালে চারিটী হইতে ছয়টী পর্য্যন্ত নির্গত হইয়া থাকে। অণ্ড গুলি অল্প হরিদ্বর্ণ হয়.

সম্প্রতি এই পক্ষী আফ্রিকা ও আমেরিকা হইতে ইয়ুরোপ-খণ্ডে আনীত হইয়া, প্রতিপালিত হইতেছে।

শুষ্ক তরু।

একদা পথের ধারে পান্থ এক জন,
জীর্ণ শীর্ণ তরু এক হেরিল, তখন
কিছু ক্ষণ থাকি পান্থ, চিন্তিত অন্তরে,
সম্বোধি কহিল পরে, সেই তরু-বরে।
"ওহে বৃক্ষ! একি দশা হয়েছে তোমার,
জীর্ণ, শীর্ণ, ভগ্ন শাখা বিকৃত আকার।
নাহি সে শ্যামল পত্র—নয়ন-রঞ্জন,
এক দিন ছিল, যারা তোমার ভূষণ।
নাহি সেই মনোহর বিহঙ্গম যত,
যারা তব ডালে বসি, গাইত নিয়ত।
শ্রান্তি-বিনাশিনী নাহি, ছায়া সহচরী,
সেবিত যে শ্রান্ত জনে, সুযতন করি।
ছিলে তুমি যবে, সদা দেখিতে সুন্দর,
কত জনে কত মতে, করিত আদর।
পথ-শ্রান্ত পান্থগণ বিশ্রাম আশায়,
আসিয়া বসিত, তব শীতল ছায়ায়।
দোলাইয়া তব পত্র, মন্দ সমীরণ,
তাল-বৃন্ত প্রায়, সবে করিত বীজন।
ছিল তব সুগায়ক, বিহঙ্গ-নিকর—
সুকণ্ঠ সুন্দর-দেহ অতি মনোহর।

সদা তারা ডালে বসি, সুললিত গান
করিত রে, সকলের মোহিয়া পরাণ।
নাই, নাই, নাই, হায়! এবে কিছু তার,
এখন বড়ই দেখি, দুর্দ্দশা তোমার।
ধরাশায়ি পত্র, তব প্রিয় আভরণ,
(সমুদয় শুষ্ক) সবে করিছে দলন।
কুঠার আনিয়া যত কাঠুরিয়াগণ,
আসি তব অঙ্গ এবে, করিবে ছেদন।
শুন হে পথিকবর! জানিও নিশ্চয়,
চিরদিন এক দশা কাহারো না রয়।
জীর্ণ, শীর্ণ, রুগ্ন যারে, হেরিবে যখন,
অনাদর করিও না, তাহারে তখন।

তাজমহল।

আগ্রা নগরে "তাজমহল" নামে একটী সুন্দর সমাধি-মন্দির আছে। ইহা পৃথিবীর মধ্যে একটী অতি উৎকৃষ্ট অট্টালিকা। সৌন্দর্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্যে ইহার তুল্য মনোহর মন্দির প্রায় দেখা যায় না। সাহ জহান নামে দিল্লীর একজন মোগল-বংশীয় বাদসাহ এই অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন।

সাহ জহানের মমতাজমহল নামে মহিষী ছিলেন। এই মহিষী মৃত্যু-সময়ে, সাহ জহানকে কহেন, "আমার সমাধির উপর এমন একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইবে যে, তাহা যেন সৌন্দর্য্যে ও শিল্প-নৈপুণ্যে জগতে অতুল্য হয়"। সাহ জহান, স্বীয় মহিষী মমতাজমহলের এই শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হন, এবং বহু পরিশ্রমে ও বহুব্যয়ে একটী অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া, আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। মমতাজমহলের নাম অনুসারে এই সমাধি-মন্দিরের নাম "মমতাজমহল" হয়। ক্রমে এই "মমতাজমহল" তাজমহল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

সাহ জহান, প্রিয়তমা মহিষীর এই সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহার জন্য আরব, বোগ্‌দাদ সিংহল, মিশর, কোমায়ুন প্রভৃতি অনেক দেশ হইতে নানা প্রকার বহু মূল্যের প্রস্তর সংগ্রহ করা হইয়াছিল। যে সকল শিল্পী, এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত হয়, তাহাদের অনেকের মাসিক

বেতন, দুই শত হইতে হাজার টাকা পর্য্যন্ত ছিল। নিম্নে এবিষয়ের এক তালিকা দেওয়া যাইতেছে ; ইহাতে কয়েক জন শিল্পকরের নাম, এবং কে কত মাসিক বেতন পাইত, জানা যাইবেঃ—

নাম	বেতন।
রোমের একজন খ্রীষ্টান	১,০০০ টাকা।
আমানত খাঁ	১,০০০ টাকা
মহম্মদ জনাফ খাঁ	৫০০ ,,
মহম্মদ সেরিফ	৫০০ ,,
ইস্মাইল খাঁ	৫০০ ,,
মোহন লাল	৫০০ ,,
লাহোরবাসী মনওয়ার লাল	৫০০ ,,
ঐ মোহন লাল	২৮০ ,,
ঐ খাতম খাঁ	২০০ ,,
বোগ্‌দাদবাসী মহম্মদ খাঁ	৯০০ ,,

এই সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শিল্পকরদিগের শিল্প-নৈপুণ্যেই তাজমহল নির্ম্মিত হয়। দর্শক মাত্রেই আগ্রার এই তাজমহলের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া, মোহিত হইয়াছেন। এই সমাধি-মন্দির

যমুনার তটে অবস্থিত। যমুনা হইতে দেখিলে ইহার সৌন্দর্য্য অধিকতর পরিস্ফুট হয়। তাজ-মহল সুদৃশ্য প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা এমন বহুমূল্য রত্নে সুসজ্জিত ছিল যে, অনেকেই লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, সেই সকল রত্ন অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে আর রত্ন সকল তাজমহলে পূর্ব্বের ন্যায় সজ্জিত নাই। রত্ন-বিহীন হইলেও, এক্ষণে তাজমহলের যে শোভা আছে, সমস্ত ভারতবর্ষের অন্যান্য অট্টালিকার শোভার সহিত তাহার তুলনা হয় না।

তাজমহল নির্ম্মাণে সর্ব্বসমেত চারি কোটী, এগার লক্ষ, আটচল্লিশ হাজার, আটশত ছাব্বিস টাকা ব্যয় হয়। সাহজহান প্রজাদের নিকট হইতে, বলপূর্ব্বক এই অর্থ সংগ্রহ করেন নাই। তিনি এমন সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিতেন যে, তাঁহার রাজ্যে প্রতিবৎসর অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইত। সাহ জহান এই উদ্বৃত্ত টাকায় অট্টালিকা-নির্ম্মাণ করিয়া, আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, ইহা নির্ম্মাণ করিতে কুড়ি বৎসর লাগিয়াছিল। প্রত্যহ বাইশ হাজার লোক

ইহার কাজ করিত। যাহা হউক, তাজমহলের নাম কখনও কেহই ভুলিতে পারিবে না, এবং ইহার নির্ম্মাণ-কর্ত্তা সাহ জহানের নামও কখন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

সন্ধ্যাকাল।

দিবা অবসান হ'ল লোহিত তপন
সোণার আভায় মাখি, পশ্চিম গগন,
আপনার কাজ সারি, গেল অস্তাচলে।
উঠিল তারকা-কুল, গগন-মণ্ডলে।
পাখিগণ গেল সবে, আপন বাসায়,
রাখাল গরুর পাল লয়ে বাটী যায়।
শোভাকর শশধর প্রকাশিয়া কর,
আলোকিত ধরাতল করিল সত্বর।
নিরখিয়া সুধাকর গগন-মণ্ডলে,
হাসিল কুমুদ-কুল সরসীর জলে।
রজত-সলিলা ওই তরঙ্গ-রঙ্গিণী,
সাগরের পানে ধায়—মৃদুল-গামিনী,
চাঁদের কিরণ দেখ, উহার উপর
খেলিতেছে, ধীরে ধীরে কিবা মনোহর।

এদিকে চাঁদের করে হর্ষিত হইয়া,
পাপীয়া করিছে গান, উড়িয়া উড়িয়া।
আবার চাঁদের আলো বিমল ধারায়
পড়িয়া, গাছের যত পাতায় পাতায়,
বিস্তার করিছে কিবা, শোভা মনোহর,
জুড়ায় দেখিলে তাহা, তাপিত অন্তর।
এই রূপ এক চাঁদ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে
অপরূপ শোভাময় করিছে ভূতলে,
যে রচিল এই চাঁদ—পরম সুন্দর,
যাঁহার আদেশে হ'ল বিশ্ব শোভাকর।
সৃষ্টির কারণ তিনি, পুরুষ প্রধান,
জীবের জীবনদাতা, করুণানিধান।
জগতঈশ্বরে সেই—বিপত্তি-বারণ,
ভুল না কখন শিশু! ভুল না কখন।

চৈতন্য।

আমাদের দেশে অনেক বড় বড় লোক জন্মিয়া, নানাবিধ সৎকার্য্যে আপনাদের নাম চির-স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা যদিও অনেকে দরিদ্র ছিলেন, তথাপি অসাধারণ অধ্য-

বসায় ও পরিশ্রম-বলে এমন সুপণ্ডিত ও সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন যে, লোক দলে দলে নানা দেশ হইতে আসিয়া, ইঁহাদের শিষ্য হইত। যত দিন বিদ্যার সমাদর থাকিবে, ততদিন ইঁহাদের নাম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। এ স্থলে ইঁহাদের এক জনের জীবন-চরিত সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। ইনি আমাদের দেশের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইঁহার নাম চৈতন্য (১)।

জগন্নাথ মিশ্র নামে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীহট্ট হইতে গঙ্গাবাস উদ্দেশে, নবদ্বীপে আসিয়া, বাস করেন। চৈতন্য এই জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র তাঁহার মাতার নাম শচী। চৈতন্য ত্রয়োদশ মাস, মাতৃ-গর্ভে বাস করিয়া, ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে, নবদ্বীপে ভূমিষ্ট হন।

চৈতন্যের অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধি ছিল। পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামে একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের নিকট চৈতন্য, বিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই অধ্যাপকের উপদেশে,

(১) ইঁহার আর একটী নাম নিমাই। গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া, লোকে ইহাকে গৌরাঙ্গও বলে।

তিনি অল্প দিনেই ন্যায়-শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের আর দুই জন বিখ্যাত ছাত্রের নাম, রঘুনন্দন ও রঘুনাথ। বাসুদেব মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র আনিয়া, নবদ্বীপে উহার অনুশীলন আরম্ভ করেন। নবদ্বীপের দুই মাইল পশ্চিমে বিদ্যানগর নামক স্থানে প্রথমে বাসুদেবের ন্যায়-শাস্ত্রের টোল প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহা হউক, চৈতন্য সর্ব্বদা প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন। এই গ্রন্থের বিষয়, তাঁহার মনে এমন দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, তিনি কখনই উহা ভুলিয়া যান নাই।

নবদ্বীপ আমাদের দেশের একটী প্রসিদ্ধ স্থান। মুসলমানেরা যখন এ দেশ আক্রমণ করে, তখন এই স্থানে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। পূর্ব্বে নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এমন প্রসিদ্ধ ছিল যে, উড়িষ্যা হইতে লাহোর এবং দক্ষিণাপথ হইতে নেপাল পর্য্যন্ত, সমস্ত দেশের ছাত্রেরা এই স্থানে সংস্কৃত শিখিতে আসিত। নবদ্বীপে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদের জন্য

আমাদের দেশ আজও সর্ব্বসাধারণের আদরণীয় হইয়া রহিয়াছে। স্মৃতি-শাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক রঘুনন্দন নবদ্বীপ-বাসী ছিলেন; এক্ষণে আমাদের দেশের অনেক ক্রিয়া-কাণ্ড, রঘুনন্দনের ব্যবস্থা-মতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে রঘুনাথ শিরোমণির অসাধারণ বিদ্যায় ও অভিজ্ঞতায়, কাশী ও মিথিলা প্রভৃতি স্থানের বড় বড় পণ্ডিতগণও বিস্মিত হইতেন, এবং সংস্কৃতজ্ঞ লোকে যে রঘুনাথকে সর্ব্বদা ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন, সেই রঘুনাথ শিরোমণির বাসস্থান, নবদ্বীপে ছিল। ইহা ভিন্ন অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপের জন্য নবদ্বীপের বিশিষ্ট খ্যাতি ছিল। কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌম (১) নামে, নবদ্বীপের এক জন তান্ত্রিকের যত্নে আমাদের দেশে, কালী পূজার পদ্ধতির সৃষ্টি হয়, এবং এক্ষণে যে জগদ্ধাত্রী পূজা হইয়া থাকে, নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র, সর্ব্ব প্রথমে সেই জগদ্ধাত্রী পূজা সম্পন্ন করেন।

এই প্রসিদ্ধ স্থানে চৈতন্যের শৈশবকাল

---

(১) ইনি আগম বাগীশ নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তন্ত্র শাস্ত্রে ইহাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

জাত হয়। চৈতন্য অধ্যবসায় ও পরিশ্রমবলে, অল্প বয়সে লেখা পড়া শিখিয়া, বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী হইয়াছিলেন। এই অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতায় তিনি উদার ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। চৈতন্যের জন্য এই সময়ে আমাদের দেশে ঈশ্বর-ভক্তি ও ঈশ্বর-নিষ্ঠা বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠে। চৈতন্য যে সময়ে ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে ইউরোপ খণ্ডের জর্ম্মণি দেশেও একজন ধর্ম্ম-প্রচারক বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার নাম লুথর।

চৈতন্য, লক্ষ্মী নামে একটী সুন্দরী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে, সর্পাঘাতে লক্ষ্মীর মৃত্যু হইলে, বিষ্ণুপ্রিয়া নামে আর একটী কুমারীর সহিত চৈতন্যের বিবাহ হয়। শৈশবকালেই চৈতন্যের পিতৃ-বিয়োগ হয়, তাঁহার ভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হন। সুতরাং মাতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার, চৈতন্যের উপরেই পড়ে। চৈতন্য এজন্য কিছুকাল সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

চৈতন্য সর্ব্বদা হরিসঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। এই সঙ্কীর্ত্তন

প্রতি রাত্রেতে শ্রীরাম নামে চৈতন্যের একজন বন্ধুর ভবনে হইত। একদা চৈতন্য শিষ্যগণের সহিত হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বাজার দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে, জগাই মাধাই নামে দুই ভাই, চৈতন্যকে সদলে আক্রমণ করে। ইহাতে চৈতন্যের সঙ্গিদের অনেকের মাথা কাটিয়া যায়, এবং মৃদঙ্গ ভগ্ন হয়। এই দাঙ্গায় পরিশেষে চৈতন্যেই জয়ী হন। জগাই, মাধাই চৈতন্যের বিশুদ্ধ ঈশ্বর-ভক্তি ও হৃদয়ের সরলতায় মুগ্ধ হইয়া, বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন ও চৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ইহার পর চৈতন্য নবদ্বীপের একজন কাজিকে আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

চব্বিশ বৎসর বয়সে চৈতন্য, কালনায় যাইয়া, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী হন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, তিনি নানা স্থানে গিয়া, ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। চৈতন্য জাতিভেদ মানিতেন না, সমুদয় জাতির লোককেই আপনার মতে আনিতেন। তিনি প্রথমে গৌড়ের নিকট-বর্ত্তী রামকালী নামক স্থানে গিয়া, কয়েক জন মুসলমানকে শিষ্য করেন। ইহার পর শান্তিপুরে

আসিয়া, অদ্বৈত আচার্য্য নামে তাঁহার এক জন শিষ্যের আলয়ে, মাতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। চৈতন্য নিতান্ত মাতৃ-ভক্ত ছিলেন, এবং মাতাকে পরম দেবতা জ্ঞানে, শ্রদ্ধা করিতেন। বৃদ্ধা শচী, আপনার পরম স্নেহভাজন তনয়কে সন্ন্যাসী দেখিয়া, নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, কাঁদিতে লাগিলেন; তাঁহার রোদনে চৈতন্যও হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা পাইয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শচী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, " বাছা নিমাই! তোমার ভাই বিশ্বরূপ যেমন ব্যবহার করিয়াছে, তুমি তেমন করিও না। তুমি সন্ন্যাসী হইয়াও ছেলেবেলার কথা ভুলিয়া যাইও না।" চৈতন্য উত্তর করিলেন, " মা! বহুযুগেও আমি তোমার ঋণ শুধিতে পারিব না। এই দেহ তোমার; তুমি যাহা আদেশ করিবে, আমি সকল সময়েই তাহা প্রতিপালন করিব। সন্ন্যাসী হইয়া আমি সংসারের সমস্ত বিষয় ছাড়িয়াছি বটে, কিন্তু তোমাকে কখন ছাড়িতে পারি নাই।"

চৈতন্য শান্তিপুর হইতে শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের অবতার জগন্নাথ

দেবের উপাসনায়, তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হয়। চৈতন্য শ্রীক্ষেত্রে সার্ব্বভৌম আচার্য্য নামে একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভগবদ্গীতার সম্বন্ধে এই পণ্ডিতের সহিত তাঁহার বিচার হয়।

কিছু দিন শ্রীক্ষেত্রে থাকিয়া, চৈতন্য দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করেন। তিনি পথিমধ্যে শ্রীরঙ্গপত্তনের (মহীসূররাজ্যের প্রধান নগর) শোভা দেখিয়া, অতিশয় পুলকিত হন, এবং কাবেরী নদীতে স্নান করিয়া, পরম সন্তোষ লাভ করেন। ক্রমে চৈতন্য, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপনীত হন। দক্ষিণাপথে যে সকল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের সকলের সহিতই চৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়, এবং সকলেই চৈতন্যের উদার ভাব, সরল ব্যবহার ও শাস্ত্র জ্ঞান দেখিয়া, সুখী হন। দাক্ষিণাপথে অবস্থান সময়ে, অনেক রাজা চৈতন্যকে নিতান্ত সম্মান ও সমাদর করিতেন। ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া, চৈতন্য প্রায়ই কোন রাজ-সভায় যাইতেন না। পণ্ডিত সার্ব্বভৌম আচার্য্য একদা চৈতন্যকে, জগন্নাথের

একজন প্রধান উপাসক, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সভায় যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু চৈতন্য বিলক্ষণ বিনয় ও নম্রতার সহিত সে অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হন।

চৈতন্যের বন্ধু শ্রীবাস যখন নবদ্বীপে গমন করেন, তখন চৈতন্য একখানি বস্ত্র ও জগন্নাথ দেবের কিছু প্রসাদ শ্রীবাসের হাতে দিয়া, কহেন, "ভাই শ্রীবাস! এই কাপড় ও প্রসাদ আমার মাকে দিবে। আমি সন্ন্যাসী হওয়াতে গৃহে থাকিতে পারি নাই, এবং সাধ্যমত তাঁহার সেবা করিতে পারি নাই, ইহাতে যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা যেন তিনি ক্ষমা করেন। আমি নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করিয়াছি। নির্ব্বোধ সন্তান, মাতার নিকট ক্ষমা পাইবার সম্পূর্ণ অধিকারী।" চৈতন্য যে নিতান্ত সরল-স্বভাব ও মাতৃ-ভক্ত ছিলেন, এই কথায় তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে।

চৈতন্য দক্ষিণ দেশ হইতে, আপনার শিষ্য দলের সহিত মিলিত হইবার জন্য, পুনর্ব্বার বঙ্গদেশে যাত্রা করেন। কটকের নিকটে আসিয়া,

তিনি একজন মুসলমান জমীদারকে আপনার শিষ্য করেন। এই জমীদার নানা প্রকার কুকর্ম্মে আসক্ত ছিল। চৈতন্য তাহাকে নানা রূপ উপদেশ দিয়া, পাপকার্য্য হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত করেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি উড়িষ্যার উত্তর পশ্চিমে অনেকগুলি ভীলকেও আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

চৈতন্য বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামে একজন সঙ্গীর সহিত বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। কাশীতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য, বিস্তর লোক একত্রিত হয়। চৈতন্য বারাণসীর ব্রাহ্মণদিগের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সদালাপ করিয়া, এলাহাবাদে উপনীত হন। এই স্থানে, রূপ নামে এক জন প্রধান শিষ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া, চৈতন্য পাঁচজন পাঠানকে শিষ্য করেন। এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি-গানে, তিনি এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার জ্ঞান একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। চৈতন্যকে সংজ্ঞা-হীন দেখিয়া, পাঁচজন পাঠান কৌতূহল-পরবশ হইয়া, সেই স্থানে আইসে। কিছুক্ষণ

পরে চৈতন্য জ্ঞান লাভ করিয়া, সেই পাঠান-দিগের সহিত ধর্ম্ম-বিষয়ক আলাপে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বরের প্রতি চৈতন্যের প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া, পাঠানগণ এমন বিমুগ্ধ হয় যে, তাহারা আর কোন কথা না কহিয়া, তাঁহার মত গ্রহণ করে। পাঠানদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া, চৈতন্য উত্তর ভারতবর্ষে "পাঠান-গোঁসাই" নামে প্রসিদ্ধ।

এইরূপে নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, এবং নানা জাতির লোকদিগকে আপনার মতে আনিয়া, চৈতন্য ছয় বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহার পরবর্ত্তী আঠার বৎসর, তিনি সর্ব্বদাই উড়িষ্যায় বাস করিয়া, জগন্নাথ দেবের উপাসনা ও হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। এই সঙ্কীর্ত্তনে এক এক সময়ে, তাঁহার জ্ঞান লোপ হইয়া যাইত। তিনি ঈশ্বর-চিন্তায় এমন আসক্ত ছিলেন যে, তাঁহার মন অন্য কোন দিকেই যাইত না। শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্যের একজন প্রিয়তম শিষ্য ছিল। তাঁহার নাম হরিদাস। বিনয়, নম্রতা ও সরলতায় হরিদাস সর্ব্বাংশে তাঁহার গুরুর

অনুরূপ ছিলেন। একদা হরিদাস কোন অরণ্যে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হন। রামচন্দ্র খাঁ নামে সেই স্থানের এক জন জমীদার, হরিদাসের উপাসনা ভঙ্গ করিয়া, তাঁহাকে পাপ-পথে আনিতে অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু হরিদাসের ধর্ম্ম-নিষ্ঠায় রামচন্দ্র খাঁর সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়া যায়।

ঈশ্বরের চিন্তা ও ঈশ্বরের উপাসনা, চৈতন্যকে জীবনের শেষ অবস্থায়, পাগল করিয়া তুলিয়াছিল: ঈশ্বরের স্তব করিতে করিতে, তিনি ভূমিতে একবারে সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পড়িতেন। এই রূপ উন্মত্ততাতেই তাঁহার জীবন বিনষ্ট হয়। কথিত আছে, একদা বসন্ত কালের রাত্রিতে পূর্ণ চন্দ্রের আলোক, সমুদ্রের নীলবর্ণ জলে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিল। চৈতন্য সেই শোভা দেখিয়া, উন্মত্ত-প্রায় হন, এবং যমুনার শ্যামল জলে শ্রীকৃষ্ণ জল-ক্রীড়া করিতেছেন ভাবিয়া, সমুদ্রে অবগাহন করেন। এক কৈবর্ত্ত মৎস্য ধরিবার জন্য, জাল নিক্ষেপ করিয়াছিল, চৈতন্যকে জলে ডুবিতে দেখিয়া, অচৈতন্য অব-

স্থায় ধরিয়া তীরে আনয়ন করিল। চৈতন্য ঈশ্বরের আরাধনা ও তপস্যার কষ্টে নিতান্ত কৃশ হইয়া ছিলেন; তীরে আসিলেও তাঁহার চেতনার সঞ্চার হইল না। চৈতন্য এই অচৈতন্য অবস্থায়, ইহ-লোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

এই রূপে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে, বঙ্গ দেশের একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন। উদারতা, সরলতা ও ঈশ্বর-ভক্তিতে চৈতন্য আমাদের দেশে অদ্বিতীয়। চৈতন্য ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, সকলকেই 'ভাই' বলিয়া, আদর করিতেন, সকলকেই সমান ভাবে দেখিতেন, এবং সকলকেই এক প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইতেন। তিনি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বেড়াইয়া, অনেককে পাপকার্য্য হইতে বিরত করিয়া, পরম ধার্ম্মিক করিয়া তুলিয়াছিলেন। চৈতন্য, দুঃখীদের দুঃখ মোচনে সর্ব্বদা যত্ন পাইতেন, এবং রোগে ঔষধ ও শোকে সান্ত্বনা দিয়া, প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিতেন। চৈতন্য, সকল প্রকার ভোগ-সুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভাল খাইব, ভাল পরিব বলিয়া, কাহারও নিকট

কখন কিছু প্রার্থনা করেন নাই ; তিনি সামান্য সন্ন্যাসীর বেশে, সামান্য দরিদ্রের ভাবে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়া, কেবল ধর্ম্ম প্রচার ও পরের উপকার করিতেন। এই রূপ পরোপকার, ধর্ম্ম-পরায়ণতা ও ঈশ্বর-নিষ্ঠায়, চৈতন্যের নাম আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালার যে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আপনার সদাশয়তায় পৃথিবীতে এত বিখ্যাত হইয়াছেন, ইহা আমাদের পরম গৌরবের বিষয়। চেষ্টা করিলেও যে, আমরা বড় লোক হইতে পারি, এবং চেষ্টা করিলেও যে, আমাদের দেশের দরিদ্রগণও পৃথিবীতে বিখ্যাত হইতে পারেন, চৈতন্যের জীবনবৃত্তান্তে, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। সদাশয়তা ও সৎকার্য্যে সকলেই পৃথিবীতে বড় লোক হইতে পারে। আমাদের দেশের এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ—চৈতন্যের ন্যায় সকলেরই পরের উপকারী, সদাশয় ও ধার্ম্মিক হওয়া উচিত।

শিশুর প্রতি।

আমরি সুন্দর শিশু! সরল-হৃদয়!
বিষয় ভাবনা তব, না হয় উদয়।
সরল মুখেতে তব হাসি অনিবার,
সরল ভাবেতে দেখ, সুখের আধার
বিপুল সংসার এই, সকলে সমান
সকল সময়ে দেখ, নাহি ভেদ জ্ঞান।
খাদ্য আহরণে, কিছু চিন্তার উদয়,
হয় না তোমার মনে, এ সুখ-সময়।
ক্ষুধার সঞ্চার হ'লে, আহার কারণ,
কাতরে মায়ের কাছে, কররে রোদন,
ক্ষুধা শান্তি হ'লে, তব জুড়ায় হৃদয়,
আনন্দ-সাগরে ভাস সকল সময়।
যেই ডাকে হাস্য-মুখে বলি আয় আয়;
হাসিয়া কোলেতে তার উঠরে ত্বরায়।
পৃথিবী মোহন বেশ করিয়া ধারণ,
জুড়ায় নয়ন তব, জুড়ায় নয়ন।
কোন রূপ চিন্তা নাহি, সরল অন্তরে,
সরল ভাবেতে খেল, আপনার ঘরে।

যেন এই সরলতা—সুখের নিলয়,
তোমার অন্তরে, শিশু ! চির দিন রয়।

শাক্য সিংহ।

চৈতন্যের বহুপূর্ব্বে, ভারতবর্ষে আর এক-জন বড় লোক ছিলেন। ইনি চৈতন্য অপেক্ষাও অভিজ্ঞতা ও ধর্ম্ম-প্রচারে, পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহার নাম শাক্য সিংহ, গৌতম অথবা বুদ্ধ।

শাক্য সিংহের পিতার নাম শুদ্ধোদন, মাতার নাম মায়া দেবী। শুদ্ধোদন বর্ত্তমান অযোধ্যার উত্তরে, নেপালের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা ছিলেন। কপিলবস্তু নামক নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। শাক্য সিংহ কপিল-বস্তুতে জন্মগ্রহণ করেন।

শাক্য সিংহ ক্ষত্রিয় ছিলেন। প্রবাদ আছে, ইঁহার বংশের এক ব্যক্তি পিতৃশাপবশতঃ গৌতম-বংশীয় কপিল মুনির আশ্রমে যাইয়া, এক শাক (সেগুন) বৃক্ষের নীচে বাস করিয়াছিলেন; ইহাতে ঐ ব্যক্তির নাম শাক্য ও গৌতম হয়।

এই শাক্য ও গৌতমের নামে, তাঁহার বংশের নামও শাক্য ও গৌতম হইয়াছে। শাক্য কুলে গৌতম বংশে জন্ম হওয়াতে, বুদ্ধ শাক্য সিংহ ও গৌতম নামে প্রসিদ্ধ হন। শাক্য সিংহের অর্থ, শাক্য-বংশের শ্রেষ্ঠ। কথিত আছে, বাল্যকালে তাঁহার নাম সিদ্ধার্থ ছিল। সিদ্ধার্থ শব্দের অর্থ, যাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। শাক্য সিংহ যখন সংসার পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার নাম বুদ্ধ হয়। বুদ্ধ শব্দের অর্থ, জ্ঞানী।

শাক্য সিংহের জন্ম-গ্রহণের সাত দিন পরে মায়া দেবীর মৃত্যু হয়। এত অল্প বয়সে মাতৃ-বিয়োগ হইলেও শাক্য সিংহকে কোন কষ্টে পড়িতে হয় নাই। শুদ্ধোদন, তনয়ের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার, আর এক জন মহিষীর হস্তে সমর্পণ করেন। এই মহিষী, শাক্য সিংহের মাতার ভগিনী। শুদ্ধোদন মায়া দেবীর জীবদ্দশাতেই, ইঁহাকে বিবাহ করেন।

শাক্য সিংহ দেখিতে বড় সুশ্রী ছিলেন, তাঁহার বুদ্ধিও বড় তীক্ষ্ণ ছিল। বাল্যকালেই

তিনি চিন্তাশীল হইয়া উঠেন। সঙ্গিদের সহিত কখন খেলা করিয়া কাল কাটাইতেন না, কেবল নিকটবর্ত্তী অরণ্যের ছায়ায় বসিয়া, চিন্তা করিতেন। তাঁহার পিতা এক দিন তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, অনেক অনুসন্ধান করেন; পরিশেষে এই অরণ্যের ছায়ায় তাঁহাকে চিন্তা-মগ্ন দেখিতে পান। শুদ্ধোদন পুত্রকে চিন্তা হইতে বিরত করিয়া, সাংসারিক বিষয়ে আসক্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চেষ্টা সফল হয় না। কিছু দিন পরে গোপা নামে একটী সুন্দরী কন্যার সহিত শাক্য সিংহের বিবাহ হয়। বিবাহের পরেও, শাক্য সিংহ পূর্ব্বের ন্যায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইহার পরে কয়েকটী ঘটনায় তিনি সংসারে বিরক্ত হইয়া, গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। এই কয়েকটী ঘটনাই তাঁহার "বুদ্ধ" হইবার কারণ।

এক দিন শাক্য সিংহ প্রমোদ-উদ্যানে যাইতে, যাইতে পথের ধারে, এক জন বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধের দেহ শীর্ণ, চর্ম্ম লোল ও দন্ত স্খলিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার সঙ্গে আর

কেহই ছিল না। বৃদ্ধ একাকী ধীরে ধীরে, কাঁপিতে কাঁপিতে, লাঠির উপর ভর দিয়া, যাইতেছিল। শাক্য সিংহ এই বৃদ্ধকে দেখিয়া ভাবিলেন, যৌবন অস্থায়ি; অতএব যৌবন-সুখে মত্ত হইয়া, ধর্ম্ম-চিন্তায় জলাঞ্জলি দেওয়া উচিত নহে। তিনি ইহা ভাবিতে ভাবিতে প্রমোদ-উদ্যানে না যাইয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

আর এক দিন শাক্য সিংহ, প্রমোদ-উদ্যানের পথে, এক জন দুর্ব্বল রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখিলেন। জ্বরে ইহার দেহ শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল, শরীরের তেজ ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল, এবং নিঃশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। এই ব্যক্তি আত্মীয়ের অভাবে, গৃহের অভাবে, একাকী কর্দ্দমের মধ্যে, পড়িয়া রহিয়াছিল। শাক্য সিংহ, এই রুগ্নকে দেখিয়া ভাবিলেন, স্বাস্থ্য স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণ-স্থায়ি। যতক্ষণ স্বাস্থ্য আছে, ততক্ষণ সৎকার্য্যে মন না দিয়া, আমোদে কাল কাটান নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এই ভাবনায় ব্যাকুল হওয়াতে, শাক্য সিংহ সে দিনও বাগানে গেলেন না, গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

শাক্য সিংহ আর এক দিন, আর এক পথে, উদ্যানে যাইতেছিলেন; এমন সময়ে হঠাৎ একটী মৃত দেহ তাঁহার নয়নগোচর হইল। মৃত ব্যক্তির শরীর বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল, এবং তাহার চারিদিকে আত্মীয়গণ রোদন করিতেছিল। শাক্য সিংহ মৃত দেহ দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, জীবন নিতান্ত অস্থায়ি। এই অস্থায়ি জীবনে ভোগ-সুখে মত্ত হওয়া উচিত নহে। ইহা ভাবিয়া, তিনি সে দিনও গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

শেষ দিন প্রমোদ উদ্যানের পথে, একজন ভিক্ষুর সহিত শাক্য সিংহের সাক্ষাৎ হইল। এই ভিক্ষু ভোগ-তৃষ্ণায় জলাঞ্জলি দিয়াছিল, সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করিয়াছিল, এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া, ধর্ম্মাচরণে নিয়োজিত হইয়াছিল। শাক্য সিংহ, এই ভিক্ষুর ন্যায় সংসার পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্ম চর্চ্চা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি তাঁহার পিতা ও পত্নীর নিকট নিজের অভিপ্রায় জানাইলেন। শুদ্ধোদন পুত্রকে সন্ন্যাসী হইতে নিষেধ করিলেন, এবং তাহার চারি দিকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। একদা রাত্রিকালে

প্রহরিগণ নিদ্রিত রহিয়াছে, এই অবসরে, শাক্য সিংহ এক জন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত, গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্ব আরোহণে সমস্ত রাত্রি যাইয়া, এক স্থানে উপনীত হইলেন; তিনি এই স্থানে ঘোটক হইতে নামিয়া, অনুচরকে ঘোটক ও আপনার সমস্ত অলঙ্কার দিয়া কপিলবস্তুতে পাঠাইয়া দিলেন। যে স্থানে শাক্য সিংহ তাঁহার অনুচরকে বিদায় দেন, সেই স্থানে একটী স্মরণ-স্তম্ভ বর্ত্তমান ছিল। চীন দেশের বিখ্যাত ভ্রমণকারী হুয়েন সাঙ্গ, কুশী নগরে যাইবার পথে, একটী বৃহৎ অরণ্যের প্রান্তভাগে এই স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। কুশীনগর বর্ত্তমান গোরক্ষপুরের ৩৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। ইহা এক্ষণে ভগ্ন দশায় পতিত রহিয়াছে।

শাক্য সিংহ প্রথমে বৈশালী (১) নগরীতে যাইয়া, একজন ব্রাহ্মণের নিকট বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। এই ব্রাহ্মণের তিন শত শিষ্য

(১) বৈশালী নগর দেওঘরের ২৩ মাইল অন্তরে গণ্ডক নদীর পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। আইন আকবরী নামক গ্রন্থের রচনা কর্ত্তা এই স্থানকে 'বিসার' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ছিল। শাক্য সিংহ অসাধারণ বুদ্ধি-বলে, ব্রাহ্মণ যাহা শিখাইতে পারেন, তাহা সমস্ত শিখিয়া, বিহারের রাজধানী রাজগৃহে*, আর এক-জন ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হন। এই অধ্যাপকের সাত শত শিষ্য ছিল। কিন্তু শাক্য সিংহ যে ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত বেড়া-ইতেছিলেন, অধ্যাপক সেই জ্ঞানের মর্ম্ম বুঝা-ইতে অসমর্থ হইলেন। সুতরাং শাক্য সিংহ হতাশ হইয়া, পাঁচজন সমপাঠীর সহিত অধ্যা-পকের নিকট বিদায় লইলেন, এবং একাগ্রচিত্তে ধর্ম্ম-চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। উরুবিল্ব পল্লীর নিকটে, শাক্য সিংহ ধর্ম্ম-চিন্তায় ছয় বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহার পর তিনি "বুদ্ধ" অর্থাৎ জ্ঞানী নাম গ্রহণ করিয়া, ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হন।

বুদ্ধ কিছুকাল বারাণসীতে অবস্থান করেন। তাঁহার পাঁচজন সমপাঠী প্রথমে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে। বুদ্ধ ইহার পর মগধরাজ বিম্বসারের অনুরোধে রাজগৃহে উপনীত হইয়া, ধর্ম্ম প্রচার

* রাজগৃহকে এক্ষণে লোকে রাজগির কহিয়া থাকে।

করিতে আরম্ভ করেন। রাজা বিম্বসার বুদ্ধের এক জন পরম বন্ধু ছিলেন। বুদ্ধ এই বন্ধুর গৃহে অনেক বৎসর যাপন করেন। কিন্তু কাল-ক্রমে বিম্বসার তাহার পুত্র অজাতশত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইলে, বুদ্ধ রাজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, কোশল-রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তীতে(১) উপনীত হন। এই স্থানে একজন সমৃদ্ধিপন্ন বণিক, বুদ্ধকে শিষ্যগণের সহিত বাসস্থানের জন্য, একটী প্রশস্ত অট্টালিকা দেন। বুদ্ধ কিছুদিন এই স্থানে থাকিয়া, ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। কোশল-রাজ্যের অধিপতি অবিলম্বে বুদ্ধের শিষ্য হইলেন। এই রূপে নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বুদ্ধ বার বৎসর পরে কপিলবস্তুতে তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি এই স্থানে কয়েকটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখাইয়া, তাঁহার পত্নী ও বংশের সমুদয় ব্যক্তিকে নিজ ধর্ম্মে আনয়ন করেন। ইহার পর বুদ্ধ রাজগৃহে উপনীত হন। এই স্থানে অজাতশত্রু, বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিছু দিন

(১) শ্রাবস্তী ঘর্ঘরা নদী ও বর্ত্তমান অযোধ্যার উত্তরে অবস্থিত। অযোধ্যা হইতে ইহা ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী।

রাজগৃহে থাকিয়া, বুদ্ধ শিষ্যগণের সহিত বৈশালীতে গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল। বুদ্ধ এই বৃদ্ধ বয়সে শিষ্যগণের সহিত বৈশালী হইতে কুশী নগরে যাইতেছিলেন, উদরাময় রোগে পথে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার শরীর স্তম্ভিত হইয়া আসিল। তিনি এই অবস্থায়, একটী অরণ্যে বিশ্রাম জন্য উপবেশন করিলেন; এই অরণ্যেই একটী শাল বৃক্ষের নীচে ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হইল। খৃষ্টের জন্ম গ্রহণের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধের মৃত্যু হয়। সুতরাং তিনি প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

বুদ্ধ যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বলে। অহিংসাই এই ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ। বুদ্ধের ধর্ম্ম ভারতবর্ষ ব্যতীত, তিব্বৎ চীন, জাপান পূর্ব্ব উপদ্বীপ প্রভৃতি দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীর ৪২ কোটী ৫০ লক্ষেরও অধিক লোক বুদ্ধের ধর্ম্ম অনুসার চলিয়া থাকে। বুদ্ধ রাজ-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও, ভোগ সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজের বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও ধর্ম্মাচরণে, একটী

বৃহৎ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জগদ্বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন।

সময়।

ধরায় অমূল্য রত্ন জানিও সময়,
বিফলে সময় কভু, করিও না ক্ষয়।
যে সময় হইয়াছে, গত এক বার,
কভু তাহা আসিবে না, ফিরিয়া আবার,
বৃথা কাজে এ সময় করিলে যাপন,
কোন দিন কোন ফল পাবে না কখন।
বড় কষ্ট হবে তব থাইতে পরিতে,
কখন সুখের মুখ পাবে না দেখিতে।
বড় দুঃখে বড় ক্লেশে আয়ু হবে ক্ষয়,
অনুতাপে দগ্ধ হবে অন্তিম সময়।
কিন্তু যদি ভাল কাজে করহ যাপন,
সময়, হইবে তব সুখ সর্ব্বক্ষণ।
চির দিন তব নাম রবে ধরাতলে,
আদরে সুবোধ বলি, মানিবে সকলে।
ধন মান খ্যাতি তব হবে অতিশয়,
কখন হবে না; কোন কষ্টের উদয়।

থাকিওনা কভু কেহ অলস হইয়া,
করিওনা আয়ু ক্ষয় কুকাজ করিয়া।
সুযতনে কায়মনে বলি বার বার,
কর সবে সময়ের ভাল ব্যবহার।

বৃষ্টি।

বৃষ্টিতে আমাদের অনেক উপকার হয়। বৃষ্টির অভাব হইলে পৃথিবী বৃক্ষ-লতা-শূন্য মরুভূমি হইয়া যায়। আমাদের দেশে যথাসময়ে বৃষ্টি না হইলে, কেমন ভয়ানক কাণ্ড হয়, তাহা দুর্ভিক্ষের বিবরণে বুঝা গিয়া থাকে।

পৃথিবীর জলরাশি হইতে সর্ব্বদা বাষ্প উঠিতেছে। এই বাষ্প বায়ুর সহিত মিশিয়া, নানা দিকে যায়, এবং ইহাই বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়িয়া থাকে। এই সকল বাষ্প হইতে মেঘ কুজ্ঝটিকা, শিশির, তুষার-শিলাও উৎপন্ন হয়। যে সমস্ত মেঘ হইতে বৃষ্টি পতিত হয়। তাহাকে "বর্ষপ্রদ" মেঘ বলা যায়। যদি বাষ্প ঊর্দ্ধে না উঠিত, তাহা হইলে বৃষ্টি বা শিশির দ্বারা পৃথিবী উর্ব্বর হইত না, সুতরাং সমুদায় স্থান

মরুভূমির ন্যায় উদ্ভিদ্ ও জীব-শূন্য হইয়া যাইত।

বায়ু যত উত্তপ্ত হয়, ততই উহাতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকে। বায়ুর তাপের হ্রাস হইলে বাষ্পের কিছু অংশ পড়িয়া যায়। এই জন্য বায়ু শীতল হইলে, বায়ুতে যে বাষ্প থাকে, তাহার কিছু ভাগ, বৃষ্টি বা শিশির রূপে পতিত হইয়া থাকে।

সকল স্থানে সমান পরিমাণে বৃষ্টি হয় না। নিম্ন স্থান অপেক্ষা উচ্চ স্থানে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। পর্ব্বতের পার্শ্বে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়; কারণ, মেঘ পর্ব্বতের গাত্রে লাগিয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করে, এই উর্দ্ধগতি জন্য উহা শীতল হইয়া, বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া থাকে। অধিত্যকা অপেক্ষা উপত্যকায়, অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়। সমুদ্র তটে অধিক বাষ্প উত্থিত হয়, সুতরাং তথায় বৃষ্টিও অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এই রূপে স্থান বিশেষে বৃষ্টির কম বেশ দেখা যায়।

সকল স্থানে, এক সময়ে বৃষ্টি হয় না। কোন কোন স্থানে বার মাসই কিছু কিছু বৃষ্টি হয়, কোথাও শীতকালে, কোথাও গ্রীষ্মে, কোথাও

হেমন্তে, কোথাও বা নিয়মিত বর্ষাকালে, বৃষ্টি হইয়া থাকে। কোন কোন দেশে, কখনও বৃষ্টি হয় না। ভূগোলবেত্তা পণ্ডিতগণ এই সমস্ত দেশকে বর্ষাহীন দেশ কহেন। তিব্বৎ দেশের অধিত্যকা, গোবি মরুভূমি, আরব দেশের উত্তর ও মধ্যভাগ, মিশর দেশ, সাহারা মরুভূমি প্রভৃতি বর্ষাবিহীন দেশ। আমেরিকার পেরু দেশে শত বর্ষের মধ্যে, দুই একবার বৃষ্টি হইয়া থাকে। তথাকার লোকেরা মেঘ গর্জ্জন কাহাকে বলে, জানে না। বৃষ্টির অভাববশতঃ অধিবাসিগণ কাগজের ঘরের ন্যায় এমন গৃহ নির্ম্মাণ করে, যে, দুই এক পসলা বৃষ্টি হইলেই, তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যদি দৈবাৎ কখনও বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সেই দেশের লোকের বড় অনিষ্ট হইয়া থাকে। পেরু দেশে এই রূপ অনাবৃষ্টি হইলেও গরুয়া নামে এক প্রকার কুজ্ঝটিকা প্রচুর পরিমাণে শিশির রূপে পতিত হইয়া, তথাকার ভূমি সিক্ত করে।

অতিশয় শীতল বায়ুর সংযোগে বাষ্প জমাট ও কঠিন হইয়া, শিলা রূপে পতিত হয়।

শীতকালে বায়ু-রাশির উপরিভাগে যে বাষ্প থাকে, তাহাতে শীতল বায়ু লাগিলে, বরফের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষার কণা পতিত হইয়া থাকে। শীত-প্রধান দেশে রাত্রিকালে এত অধিক তুষার পড়ে যে, তদ্দ্বারা মনুষ্যাদি প্রোথিত হইয়া যায়। শিলাবৃষ্টি ব্যতীত অন্তরীক্ষ হইতে আরও অনেক বস্তুর বৃষ্টি হইয়া থাকে। এক জন প্রাচীন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, একশত বৎসর হইল, লাপ্‌লাণ্ড ও ফিনমার্ক দেশে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র জাতীয় ইন্দুর, আকাশ হইতে ভূমিতে পতিত হইত। যে বৎসর এই ইন্দুর বৃষ্টি হইত, সেই বৎসরেই খেঁকশিয়ালির প্রাদুর্ভাব দেখা যাইত। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের এক স্থানে, শিলাবৃষ্টির ন্যায় ভেকবৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশিয়ার অন্তর্গত পাক্রফ নামক স্থানে, প্রচণ্ড ঝড় উপস্থিত হয়। এই ঝড়ের সময় বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, অনেক পরিমাণে কৃষ্ণবর্ণ কীট পড়িয়াছিল। একদা নরওয়ে দেশের কৃষকেরা মাঠে কৃষিকার্য্য করিতেছিল, এমন সময়ে আকাশে মেঘ উঠিল, এবং কিছুক্ষণ পরেই তাহাদের

মস্তকে বড় বড় ইন্দুর পড়িতে লাগিল। ইন্দুর ও ভেক বৃষ্টির ন্যায় মৎস্য বৃষ্টির বিবরণও শুনা যায়। এলাহাবাদে একবার মৎস্য বৃষ্টি হয়। এই মৎস্য বৃষ্টি স্কট্‌লণ্ড, ইতালী প্রভৃতি ইউরোপের অনেক দেশে অনেক বার হইয়াছে। কি কারণে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। কেহ কেহ অনুমান করেন, সমুদ্র বা নদী প্রভৃতির উপর দিয়া প্রবলবেগে যে বায়ু বহে, তাহারই বলে মৎস্য সকল উপরে উঠিয়া অন্য স্থানে পড়িয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকায় কোটাপাক্সী নামে একটী আগ্নেয় গিরি(১) আছে। তাহার নিকটেও এক বার মৎস্য বৃষ্টি হইয়াছিল। এই মৎস্য বৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করাতে প্রকাশ পায়, যখন ঐ পর্ব্বত শান্ত ছিল, তখন উহার

(১) যে সকল পর্ব্বত হইতে সময়ে সময়ে ধূম, কর্দ্দম, অগ্নিশিখা, প্রস্তর-খণ্ড প্রভৃতি ঊর্দ্ধে উঠে, তাহাকে আগ্নেয় গিরি কহে। এই ধূম, কর্দ্দম, অগ্নিশিখা প্রভৃতি নির্গত হওয়াকে অগ্ন্যুৎপাত বলা যায়। সকল সময়ে আগ্নেয় গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত হয় না। কখন কখন উহা শান্ত থাকে।

ভিতরের জলে মৎস্য জন্মিয়াছিল। পরে পর্ব্বতে অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হওয়াতে, জলের মৎস্য সকল নির্গত হইয়া, চারিদিকে পড়িয়াছিল। নরওয়ের মূষিক বৃষ্টির সম্বন্ধে এক জন গ্রন্থকার কহিয়াছেন, গ্রীষ্মকালে সহস্র সহস্র মূষিক, পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া, নিম্ন ভূমিতে গিয়া বাস করে। বোধ হয়, পথে যাইবার সময়, তৎসমুদয় প্রবল ঘূর্ণিবায়ু দ্বারা ঊর্দ্ধে উঠিয়া, নরওয়ে দেশে পড়িয়াছিল। প্রবল বায়ুবেগে এই সকল মূষিক কি রূপে বাঁচিয়াছিল, তাহা মনে করিলে, বড় বিস্ময় জন্মে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের দক্ষিণে কর্দ্দম বৃষ্টি হইয়াছিল। চীন দেশেও একবার কর্দ্দম বর্ষণ হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে লবণ বৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, অনেক স্থলে ধূলি বৃষ্টি হইয়াছে। একবার পারস্য দেশে যে, ধূলি বৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে মরে নামে একজন সাহেব এই রূপ লিখিয়াছেন, " সূর্য্যাস্তের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে, আমি পারস্যের রাজার নিকট, একখানি পত্র পড়িতেছি, এমন সময়ে এরূপ ঘোর অন্ধকার

হইল যে, সেই পত্র আর পড়িতে পারিলাম না। আমি তাড়াতাড়ি গৃহের বাহিরে আসিয়া, দেখিলাম, মেঘে সমস্ত আকাশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এই মেঘে এমন গাঢ় অন্ধকার হইল যে, অমাবস্যার রাত্রিতেও তেমন ঘোরতর অন্ধকার হয় না। এই সময়ে আমার মনে হইল, যেন চারিদিক হইতে উষ্ণ বাতাস আসিতেছে। অল্প ক্ষণেই আমার গৃহ ধূলা দ্বারা একবারে পূর্ণ হইয়া গেল। দেশের সমস্ত লোক ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। কিছু কাল পরে, এই অন্ধকার দূর হইলে, সমস্ত আকাশ ঈষৎ রক্ত বর্ণ বোধ হইতে লাগিল, অস্ত যাইবায় সময়ে সূর্য্যের আলোক ধূলি-রাশিতে পতিত হওয়াতে, এই রক্ত বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। আমি কখনও কোন স্থানে এমন উৎপাত দেখি নাই। দুই ঘণ্টার পর সকল পরিষ্কৃত হইয়া গেল। এই ধূলি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাতে কেবল প্রস্তর-কণা ও বালুকা ছিল।”

রক্ত বৃষ্টি হইলে লোকে মহা অমঙ্গল আশঙ্কা করে। এই রক্ত বৃষ্টি আর কিছুই নহে, কেবল রক্ত-বর্ণ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটের বৃষ্টি মাত্র। কোন

কোন সময়ে এই রক্তবর্ণ কীটাণু বৃষ্টিতে পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী দেশ লোহিত-বর্ণ হইয়া যায়। কেহ কেহ কহেন, সমুদ্রের এক প্রকার রক্ত-বর্ণ শৈবাল, রক্ত-বৃষ্টির কারণ।

বৃষ্টি নিবারণের নিমিত্ত জর্ম্মণি দেশের অতো নামে এক ব্যক্তি ফ্রান্সের রাজধানী পারীস নগরে একটী যন্ত্র আনিয়াছিলেন। এই যন্ত্রের নাম, বৃষ্টি-নিবারক। নগরের নিকটে একটী উচ্চ কাষ্ঠের মঞ্চে এই যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। যন্ত্রে অনেকগুলি যাঁতা ছিল। এই সকল যাঁতা, বাষ্পের বলে চলিত। যাঁতা সকল চালিত হইলে, চারিদিকে মেঘ জমিতে পারিত না, দূরে উড়িয়া যাইত। মেঘের অভাবে বৃষ্টিও হইতে পারিত না।

বনের পাখী।

বনের পাখী জুড়ায় আঁখি,
তোমার দরশনে,
সদা অবাধে, মনের সাধে,
বেড়াও বনে বনে।
মনের মত, রসাল কত,

বনের ফল খাও।
গাছের ডালে, পাতার তলে,
নাচিয়া নাচি যাও।
হরষ ভরে, মধুর স্বরে,
কর রে কত গান।
শুন্‌লে তাহা, জুড়ায় আহা,
সবাকারই প্রাণ।
পেয়েছ দেখি, তুমি রে পাখী,
স্বাধীনতার সুখ।
স্বাধীন মনে, বেড়াও বনে
দেখ্‌লে জুড়ায় বুক।
স্বাধীন মনে, পাখীর সনে,
স্বাধীন ভাবে রও।
পরাণ ভরে, আমোদ করে,
কত রে সুখী হও।
আপন মনে, আপন বনে,
আপন ভাবে থাক,
ধার না কার, কিছুর ধার,
ভাবনা নাহি রাখ।
ধিক্ তাহারে, যেই তোমারে,

তুচ্ছ সুখের তরে,
কঠোর বলে, বাঁধি শিকলে,
রাখে খাঁচায় ভরে।
নাহিক দয়া, নাহিক মায়া,
পশুর মত সেই।
রাখে খাঁচায়, বড় জ্বালায়,
বনের পাখী সেই।

জগন্নাথ ও রমানাথ।

পরিশ্রম, উৎসাহ ও যত্ন থাকিলে নানা-প্রকার বাধা অতিক্রম করিয়াও, সংসারে বড় লোক হইতে পারা যায়। আমাদের দেশের অনেকে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া এই, পরিশ্রম, উৎসাহ ও যত্নের বলে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন, এবং অনেক সৎকার্য্য করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও রমানাথ কবিরাজ এই শ্রেণীর লোক। বিদ্যা অভ্যাস ও সৎকার্য্য করিলে, আমরা সাধারণের নিকট, কেমন শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইতে পারি, তাহা ইহাঁদের বিবরণে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

জগন্নাথ দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। ত্রিবেণী গ্রামে ১১০২ সালে (১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। রুদ্রদেব সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি সংস্কৃতে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। জগন্নাথ যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন রুদ্রদেবের বয়স ছয়ষষ্টি বৎসর হইয়াছিল।

রুদ্রদেব তর্কবাগীশ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। ক্রিয়াকাণ্ডের নিমন্ত্রণ ও শিষ্য যজমান হইতে যাহা লাভ হইত, তাহা দ্বারা অতি কষ্টে পরিবার বর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। জগন্নাথ পাঁচ বৎসর বয়সে বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। তিনি পিতার নিকট মুখে মুখে ব্যাকরণ ও অভিধান শিখিয়া, কয়েক খানি সাহিত্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার এমন অধ্যবসায় ও যত্ন ছিল যে, পূর্ব্বে যাহা না পড়া হইয়াছে, তাহাও পঠিত পাঠের ন্যায় আবৃত্তি করিতে পারিতেন। হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বংশবাটীতে (বাঁশবেড়িয়া) জগন্নাথের জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যায়লঙ্কারের একটী চতুষ্পাঠী ছিল। জগন্নাথ এই চৌবাড়ীতে

স্মৃতিশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার বয়স বার বৎসর, তখন তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। স্মৃতির পর জগন্নাথ ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া তাহাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

জগন্নাথের যখন বার বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রুদ্রদেব দরিদ্র ছিলেন, তাঁহার কিছুরই সংস্থান ছিল না। জগন্নাথ সমুদয় বিক্রয় করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করিলেন। যথাসর্ব্বস্ব যাওয়াতে জগন্নাথের কষ্টের অবধি রহিল না। তিনি অপরের নিকট গৃহকর্ম্মের দ্রব্যাদি চাহিয়া, কাজ করিতে লাগিলেন। এইরূপ দুরবস্থায় পড়াতে জগন্নাথকে পড়া ছাড়িয়া, অর্থ উপার্জ্জনের পথ দেখিতে হইল। এই সময়ে জগন্নাথ তাঁহার অধ্যাপকের নিকট হইতে "তর্কপঞ্চানন" উপাধি লাভ করেন।

জগন্নাথ কোন রূপে একটী টোল খুলিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী এমন উৎকৃষ্ট ও তাঁহার পাণ্ডিত্য

এমন অসাধারণ ছিল যে, শীঘ্রই তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপিয়া পড়িল, বড় বড় ক্রিয়া কাণ্ড উপলক্ষে নানা স্থান হইতে তাঁহার নিকট নিমন্ত্রণ-পত্র আসিতে লাগিল। অনেক ধর্ম্ম-পরায়ণ ও বিদ্যোৎসাহী মহাত্মা তাঁহাকে নিষ্কর ভুমি দিতে লাগিলেন। আপনার বিদ্যা বুদ্ধির প্রসাদে, জগন্নাথ ক্রমে অনেক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিদ্বান্ বলিয়া, জগন্নাথ এমন মাননীয় ছিলেন যে, অনেক বড় বড় লোকে তাঁহাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। কলিকাতার প্রধান শাসন-কর্ত্তা সর জন সোর, প্রধান বিচারপতি সর উইলিয়ম জোন্স, বর্দ্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায়, রাজা নবকৃষ্ণ প্রভৃতির নিকট জগন্নাথের বিশিষ্ট সম্ভ্রম ছিল। সর উইলিয়ম জোন্স প্রায়ই স্ত্রীর সঙ্গে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। জোন্স সাহেব জগন্নাথকে এত ভাল বাসিতেন ও এত শ্রদ্ধা করিতেন যে, চোর ডাকাইতের উপদ্রব কালে, নিজ হইতে বেতন দিয়া, কয়েকজন সিপাহি তাঁহার বাটীতে

পাহারার কাজে রাখিয়াছিলেন। আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সম্বন্ধে জগন্নাথ যে ব্যবস্থা দিতেন, বড় আদালতের বিচার-পণ্ডিতগণ তদনুসারে বিচার করিতেন। সর জন্ সোর ও সর উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতির অনুরোধে, জগন্নাথ আইন সম্বন্ধে দুই খানি বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন; যত দিন তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তত দিন মাসিক পাঁচ শত টাকা পাইতেন। কাজ শেষ হইয়া গেলেও, তাঁহার মাসিক তিন শত টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। এই গ্রন্থ সঙ্কলন ব্যতীত জগন্নাথ আরও কয়েক খানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এমন সুনিয়মে শিক্ষা দিতেন যে, নানা স্থান হইতে শিক্ষার্থিগণ আসিয়া, তাঁহার শিষ্য হইত। তাঁহার অনেক ছাত্রও বড় বড় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ১২১৪ (১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে) ১১১ বৎসর বয়সে জগন্নাথের মৃত্যু হয়। জগন্নাথ এই সুদীর্ঘ জীবনে সাধারণের নিকট অনেক সম্মান পাইয়াছিলেন। ছোট বড়, ভদ্র ইতর, সকলেই তাঁহাকে সমাদর করিত। জগন্নাথের স্মৃতি-শক্তি এমন প্রবল ছিল যে,

অভিজ্ঞান শকুন্তল নামে এক খানি সংস্কৃত নাটকের আদ্যোপান্ত, না দেখিয়া আবৃত্তি করিতে পারিতেন। জগন্নাথের স্মরণ-শক্তির সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। এক দিন জগন্নাথ স্নান করিয়া, ঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিতেছেন, এমন সময়ে দৈবাৎ সেই স্থানে দুই জন সাহেব পরস্পর কলহ করিতে করিতে মারামারি করিল। এজন্য এক জন সাহেব আর এক জনের নামে নালিশ করে। অভিযোগকারী সাহেব বিচারালয়ে কহিল, ঘাটে কেহই ছিল না, কেবল এক ব্যক্তি গায় মাটী মাখিয়া বসিয়াছিল। এই ব্যক্তিই জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন; সুতরাং সাক্ষী হইয়া জগন্নাথকে আদালতে আসিতে হইল। জগন্নাথ ইংরেজী জানিতেন না; তথাপি অদ্ভুত স্মরণ-শক্তি-বলে দুই জন সাহেব ঘাটে যে যে কথা কহিয়াছিল, তৎসমুদয় এমন সুপ্রণালীতে আবৃত্তি করিলেন যে, বিচারপতি তাহা শুনিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইয়া, জগন্নাথকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, এবং পরে তাঁহাকে একটী রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

জগন্নাথের পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে একটী পিত্তলের জল পাত্র, দশ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও এক খানি অতি জীর্ণ খড়ের ঘর মাত্র ছিল। কিন্তু জগন্নাথ অসাধারণ বিদ্যাবলে নগদ এক লক্ষ টাকা ও বার্ষিক চারি হাজার টাকা উপস্বত্বের নিষ্কর ভূমি রাখিয়া যান। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তানগণ এই সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

জগন্নাথের ন্যায় রমানাথও প্রথমে সাতিশয় দরিদ্র ছিলেন। রমানাথের পিতার নাম সুদর্শন সেন। কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী কড়ুই গ্রামে সুদর্শনের বাস ছিল। রমানাথ ১৭৪৩ শকে বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত হালাড়া গ্রামে, তাঁহার মাতামহের আলয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯ বৎসর পর্য্যন্ত কড়ুই গ্রামে পিত্রালয়ে প্রতিপালিত হন। অনন্তর পিতার মৃত্যু হইলে, দুঃখিনী জননী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারকানাথ সেনের সহিত মাতামহের গৃহে আসিয়া আশ্রয় লন। তাঁহার মাতামহের নাম রামসুন্দর গুপ্ত। ইনি এক জন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। এই খানে রমানাথ, রামধন শিরোমণির নিকট ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন।

ইহার পর শিরোমণি মহাশয় জামালপুরে টোল খুলিলে, রমানাথ তথায় যাইয়া, এক বৎসর কাল এই ব্যাকরণ শাস্ত্রের আলোচনা করেন। পোনর বৎসর বয়সে, রমানাথের মাতৃবিয়োগ হয়। এদিকে তাঁহার মাতামহ অন্ধ হন; মাতুলগণও যার পর নাই দুরবস্থায় পড়েন। এ জন্য রমানাথের কষ্টের এক শেষ হয়। তিনি সর্ব্বদা শত গ্রন্থি-যুক্ত জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিতেন, এবং কোন রূপে এক মুষ্টি অন্নের যোগাড় করিয়া, উদর পূর্ত্তি করিতেন। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এক বেলা কেবল আম্র খাইয়াই থাকিতেন। ভাল খাইব ভাল পরিব বলিয়া, গুরু জনের নিকট কখনও আবদার করিতেন না। কাহারও বাটীতে নিমন্ত্রণ হইলে, পাছে ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র দেখিয়া, লোকে ঘৃণা করে, এই ভয়ে রমানাথ বাহির বাটী দিয়া, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন না, খিড়কীর দ্বার দিয়া, বাটীর মধ্যে যাইয়া, ভোজন করিয়া আসিতেন। মাতুলদিগের যারপর নাই দুরবস্থা দেখিয়া, রমানাথ আর তাঁহাদের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। বিদ্যাশিক্ষার ছলে মাতুলের আলয়

হইতে বহির্গত হইলেন। এই সময়ে তিনি বর্দ্ধমান ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামের আত্মীয় কুটুম্বদিগের নিকট এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, কেহই তাহাকে সে সময়ে আশ্রয় দেন নাই। অন্ন বস্ত্রের অভাবে তাহার এমন কষ্ট হয় যে, তিনি কোন কুটুম্বের চাকর হইতেও লজ্জিত হন নাই, তথাপি রমানাথের অদৃষ্টে আশ্রয় স্থান ঘটিয়া উঠে নাই। এইরূপে দুরবস্থার এক শেষ হইলেও রমানাথ একদিনের জন্যও বিদ্যাশিক্ষায় অমনোযোগী বা যত্নহীন হন নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণপুরে মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণির নিকট যাইয়া, প্রায় পাঁচবৎসর কাল তাঁহার টোলে থাকিয়া, ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বিদ্যা উপার্জ্জনে রমানাথ এমন যত্নবান ছিলেন যে, কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই বোধ করিতেন না। তিনি এই সময়ে কেবল তেঁতুল ভাতে ভাত খাইয়া, পাঠ অভ্যাস করেন।

রমানাথ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণপুর তৎপরে রাজারামপুরে পড়িয়া, বাটীতে ফিরিয়া আইসেন। এই

সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের মৃত্যু হয়। রমা-নাথ ভ্রাতার মৃত্যুতে সাতিশয় কাতর হইয়া, পদ-ব্রজে মুরসিদাবাদে গমন করেন। পথে তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহিতে হয়। তিনি মুরসিদাবাদে থাকিয়া, দুইবৎসর কাল ন্যায়শাস্ত্র পড়েন। এই দুই বৎসর তাঁহাকে হরিসিংহ নামে এক জন জমীদারের অতিথিশালায় থাকিতে হইত। অতিথি-শালায় সকলে অর্দ্ধ সের ছোলা ও একটু লবণ পাইত। রমানাথ এই দুই বৎসর, কেবল ছোলা ও লবণ খাইয়া, ন্যায়শাস্ত্র অভ্যাস করেন। এই স্থানে তাঁহার দুটী সমপাঠী ছিলেন। এই তিন জনে একত্র স্নান, একত্র আহার ও একত্র শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন। রমানাথ এই রূপে সমপাঠিদের সঙ্গে রাত্রি-কালে পাতা জ্বালিয়া, পাঠ অভ্যাস করিতেন; এবং শীত-বস্ত্রের অভাবে সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিয়া থাকিতেন। তাঁহার একখানি মাত্র রংকরা কাপড় ছিল; স্নান করিয়া তিনি ইহার এক ভাগ পরিয়া, অপর ভাগ রৌদ্রে শুকাইতেন। রমানাথ এমন দুরবস্থায় পড়িয়াও, সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্তে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। এক দিন রমানাথ অধ্যাপকের নিকট

পড়িয়া অনেক বেলায় বাসায় ফিরিয়া আসিতেছেন, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, এমন সময়ে পথের ধারে দেখিলেন, এক জন কৃষক ক্ষেত্রে বার্ত্তাকু তুলিতেছে; রমানাথ ক্ষুধায় কাতর হইয়া, কয়েকটা বার্ত্তাকু চাহিলেন, কৃষক গোটা কতক কচি কচি বার্ত্তাকু তাঁহাকে দিল; তিনি উহা পরম পরিতোষের সহিত ভোজন করিয়া, ক্ষুধা নিবৃত্তি করিলেন।

রমানাথ মুরশিদাবাদ হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া, রাম কবিরাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিখিতে প্রবৃত্ত হন। এই স্থানে দুই বৎসর শিক্ষা করিয়া, তাঁহার মাতুলের বাটীতে আসিয়া, কনিষ্ঠ মাতামহের নিকট আবার ঐ শাস্ত্র অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। এই রূপে চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া, রমানাথ ২৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চিকিৎসা করিবার অভিপ্রায়ে, কলিকাতায় আইসেন। কলিকাতায় চিকিৎসাশাস্ত্রে রমানাথের অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। ক্রমে চিকিৎসা-কার্য্যে তাঁহার খ্যাতি এত দূর বাড়িয়া উঠে যে, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, পঞ্জাব, রাজপুতনা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে

অনেক বড় বড় জমীদার ও রাজারা চিকিৎসার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আসিতেন। অনেক প্রসিদ্ধ ইংরেজ ডাক্তারও তাঁহাকে সাতিশয় সমাদর ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই রূপে প্রসিদ্ধ ও শ্রদ্ধাস্পদ সুচিকিৎসক হইয়া, রমানাথ অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন। গত ১২৮৫ সালের ২৬এ পৌষ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বয়স প্রায় ৫৭ বৎসর হইয়াছিল।

রমানাথ কবিরাজ মাসে তিন, চারি হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এই সমস্ত টাকা অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধ বিতরণেই শেষ হইত। রমানাথ যে অন্নের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া, বেড়াইয়া ছিলেন, সচ্ছল অবস্থায় সেই অন্ন অকাতরে দীন দুঃখিদিগকে দান করিতেন। তিনি প্রতিদিন নিজ বাসায় ও বীরভূমের অন্তর্গত নিজ বাটীতে, তিন চারি শত লোককে অন্ন দিতেন। অনেক গুলি বিদ্যালয়ের ছাত্র কেবল তাঁহার সাহায্যেই প্রতিপালিত হইত। তিনি ইহাদের স্কুলের বেতন, পুস্তক, বস্ত্র, জলখাবার, সমুদয়ই দিতেন। প্রতিদিন প্রায় চারি পাঁচ শত রোগী

তাঁহার নিকট বিনামূল্যে ঔষধ পাইত। বাসায় যত লোক থাকিত, তিনি তাহাদের বাটীর খরচ পর্য্যন্ত দিতেন। রমানাথ অনেককে যত্নের সহিত কবিরাজি শিক্ষা দিতেন। তাঁহার অনেক ছাত্র বড় বড় কবিরাজ হইয়া, নানা স্থানে চিকিৎসা করিতেছেন। ইহা ভিন্ন রমানাথ ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ও দীন দুঃখীদিগকে অর্থ দান করিতেন। এই সকল দানে রমানাথের কিছু মাত্র আড়ম্বর ছিল না। তাঁহার কার্য্য এত নীরবে সম্পন্ন হইত যে, অনেক স্থলে তিনি ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী ভিন্ন, আর কেহই উহা জানিতে পারিত না। মহারাণী যে সময়ে ভারতবর্ষের অধিশ্বরী পদ গ্রহণ করেন, সেই সময়ে গবর্ণমেণ্ট রমানাথকে একখানি প্রশংসা-পত্র দিয়া ছিলেন

দেখ, জগন্নাথ ও রমানাথ কেমন লোক ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই দরিদ্রের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং উভয়েই বাল্যকালে যারপরনাই কষ্টে পতিত হন। কিন্তু দুরবস্থায় পড়িয়াও, যত্ন, উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত বিদ্যা উপার্জ্জনে অবহেলা করেন নাই। শেষে এই বিদ্যার

প্রসাদেই ইঁহাদের দুরবস্থা দূর হইয়া, সৌভাগ্যের উদয় হয়, এবং জনসমাজে সুখ্যাতি বাড়িয়া উঠে। ইঁহারা মনোযোগ দিয়া লেখা পড়া না করিলে কখনও অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন না, এবং কখনও অপরের কষ্ট ও অসুবিধা দূর করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন না। তোমরা সুশীল, শান্ত ও বিনয়ী হইয়া, মনোযোগ দিয়া, বিদ্যা অভ্যাস কর, জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন ও রসানাথ কবিরাজের মত বড় লোক হইতে পারিবে।

সমাপ্ত।